আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮

স্বজন

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

BCSWN
UNITY FOR EQUITY
BANGLADESH CIVIL SERVICE WOMEN NETWORK

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

স্বজন-সাহিত্য সাময়িকী

চতুর্থ সংখ্যা

প্রকাশনা উপকমিটি

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড - আহ্বায়ক

বিলকিস বেগম, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য

সালমা বেগম, সহকারী অধ্যাপক, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা - সদস্যসচিব

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা

কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং

১/৭, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রকাশকালঃ

১১ মার্চ ২০১৮

উৎসর্গ

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যে সকল
নারীশক্তির সম্মিলিত প্রয়াসে
আজকের নারীদের অবস্থান ও
ক্ষমতায়নের উৎস, সে সকল মহতী
ও আলোকিত অগ্রজদের জানাই
গভীর কৃতজ্ঞতা।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
প্রধান অতিথি
শেখ হাসিনা
২০১৬

উপদেষ্টা পরিষদ

সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সচিব, অর্থ বিভাগ।

সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ, ঢাকা।

ড. শেলীনা আফরোজ
সচিব (অবঃ), মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়।

বেগম মুশফেকা ইকফাৎ
সিনিয়র সচিব (অবঃ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আক্তারী মমতাজ
সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন।

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন
মহাপরিচালক (প্রাক্তন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফাতেমা বেগম
অতিরিক্ত আইজিপি (অব), বাংলাদেশ পুলিশ।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	: **সুরাইয়া বেগম,** এনডিসি সিনিয়র সচিব (অবঃ)
সহ- সভাপতি	: **নাছিমা বেগম,** এনডিসি সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	: **দিলরুবা** প্রাক্তন সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
সহ-সভাপতি	: **প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ** প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড।
মহা-সচিব	: **নাসরিন আক্তার** মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত সচিব) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি।
যুগ্ম মহাসচিব	: **ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম** কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
যুগ্ম মহাসচিব	: **রৌশন আরা বেগম,** এনডিসি ডিআইজি, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
কোষাধ্যক্ষ	: **রাশিদা বেগম** অতিরিক্ত সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
সহকারী কোষাধ্যক্ষ	: **শাহেদা খানম** সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, ঢাকা।
সাংগঠনিক সম্পাদক	: **শেখ মোমেনা মনি** উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
দপ্তর সম্পাদক	: **শিরীন রুবী** উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
কল্যাণ সম্পাদক	: **দিলরুবা শাহিনা** উপপ্রধান, এসইপি প্রকল্প।

যোগাযোগ, প্রচার ও তথ্য সম্পাদক : ড. বিলকিস বেগম
উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক : সালমা বেগম
সহকারী অধ্যাপক
সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

উন্নয়ন ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক : ফারহিনা আহমেদ
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সদস্য

শাহনাজ পারভীন
প্রেসিডেন্ট, কাস্টম এক্সাইজ ঢাকা।

সানজিদা খাতুন
কমিশনার, ইনকাম ট্যাক্স, ঢাকা।

মোছাঃ মোবাশ্বেরা কাদেরী
সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়।

তানিয়া খান
উপপ্রধান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

নাঈমা হোসেন
উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আছমা সুলতানা
উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

স্বজনের বর্ণমালা ০১
মুখবন্ধ ০১
আহ্বায়কের কথা ০১

কবিতা

সমতা - নাছিমা বেগম এনডিসি ০১
মেঘ বরণ কনে - আকতারী মমতাজ ০২
উড়ন্ত বর্ষার ফলা - দিলারা হাফিজ ০৩
বাইরে এবং ঘরে - মাজেদা রফিকুন নেছা এনডিসি ০৪
মা, তোমার কুসুম মুখচ্ছবি - লুৎফুন নাহার বেগম ০৫
চেয়েছি পাখির জীবন - নাঈমা হোসেন সুবর্ণা ১৭
আমার প্রাত্যহিকতা - সুলতানা ইয়াসমীন ১৯
বাদলা দিনের প্রেম - পীতাঞ্জলি বড়ুয়া ২০
নস্টালজিয়া - ড. হোসনে-আরা বেগম মার্জনা ২১
বাবু'দা - রাবেয়া বসরী (রেবা আফরোজ) ২৩
নারী তুমি - ফৌজিয়া আখতার ২৫
রায়ান - শারমীন আক্তার ২৬
আপন আলোয় - রাধু বড়ুয়া চৌধুরী ২৭
উপলব্ধি - ফারজানা বিলকিস ২৮

প্রবন্ধ

ঘুরে এলাম ভারত মহাসাগর - প্রফেসর ফাহিমা খাতুন ২৯
What Can You Learn From the Hubert H. Humphrey Fellowship? - Al-Beli Afifa ৩৫
গৃহকর্মের শ্রমবিভাজন এবং কর্মজীবী নারী - ড. মালেকা বিলকিস ৪০
বিশ্ব নারী দিবস ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে: নারী ভাবনা - মালেকা আক্তার চৌধুরী ৪৩
সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশের নারী পুলিশ - শামীমা বেগম পিপিএম ৪৯
ভায়া (VIA) ও সিবিই (CBE): বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট - ডাঃ ইসমত আরা লাইজু ৫৪
অটিজম- চাই সচেতনতা - আছমা সুলতানা (বন্যা) ৫৬
নারীর সক্ষমতার সাতকাহন - হোসনে আরা রিনা ৬২
সাগরকন্যার সান্নিধ্যে - সৈয়দা তাসলিমা আক্তার ৬৪

পাঁচ মিনিট সমান সমান	- জেবুন্নেছা জেরী	৬৮
সায়েন্স ফিকশন গল্প: ক্লিনার	- নাসরীন জাহান লিপি	৭১
নারী আন্দোলন ও নারী দিবসের প্রেক্ষাপট	- জিনাত আফরীন	৭৫
ভূত কাহন : স্মৃতি কথা	- হুমায়ারা আক্তার	৭৮
লুকায়িত অর্থনীতি দৃশ্যমান হবে কি?	- ড. আলেয়া পারভীন	৮৩
বাংলাদেশ ও নারী	- ফাতেমা ইয়াসমীন তনুজা	৮৬
নারীর ক্ষমতায়ন	- রায়হানা তসলিম	৯৪
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও ভোটাধিকার	- সালমা বেগম	১০০
পরিবেশ ও নারীবাদ	- প্রফেসর নাছিমা আক্তার চৌধুরী	১০৪
Action Research As a Means of Intelligence Led Policing	-Tanzina Chowdhury	১০৮
Women and Men in Bangladesh Facts and Figures	- Mst. Maksuda Shilpi	১১১
নেটওয়ার্কের কার্যক্রমের অংশবিশেষ		১২০

সভাপতি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

স্বজনের বর্ণমালা

মানুষ তার আত্মোপলব্ধি থেকে লেখা-লেখির মাধ্যমে গান, কবিতা, কাব্য- সাহিত্য রচনা করেন। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যাঁরা ফাইলে নোট লিখতে, মোবাইল কোর্টে বিচারকের আসনে বসে বা ক্লাসে লেকচার দিতে গিয়ে ছন্দের মালা গাঁথেন। কেউবা নিজের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার ডায়েরীর ঝাপি খুলে রেখে যেতে চান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। যুগে যুগেই অনেক গান গাওয়া হয়েছে মুখে মুখে। মায়েরা অনেক গল্প, কল্প কাহিনী শুনিয়েছেন আবার নিজের অজান্তেই তৈরী হওয়া গুন গুন গানে ঘুম পাড়িয়েছেন সন্তানদের। আমরা যাঁরা প্রতিদিন ফাইলে অজস্র কথা লিখি, তা কোন সাহিত্য বা লেখা লেখির কাতারে পরে না। এগুলোর ভাষা থাকলেও এর কাব্যিক বা সাহিত্যিক মূল্য নেই। তবে ফাইলগুলো কোন আজব আঁকি-বুকি নয়। সেখানেও কিছু কথা থাকে, থাকে মানুষের জীবনালেখ্য। তবে কখনো কখনো ফাইলের একটি সিদ্ধান্ত 'বছরের ১লা তারিখেই বই' বা 'নিরাপদ মাতৃত্ব' ঘিরেই রচনা হতে পারে শত কবিতা বা অমূল্য সাহিত্য সম্ভার। কোন কোন ক্ষেত্রে শত বছর ধরেও তার ঐতিহাসিক মূল্য থাকে অপরিসীম।

'স্বজন' কর্মকর্তারা এখন আগের চেয়ে আরো বেশী সক্রিয়। স্বজনের বন্ধনে গড়ে উঠা পরিচিতি এখন সখ্যতা- বন্ধুত্বে প্রাণিত করছে ২৮ ক্যাডারের নারী সদস্যদের। নবীন - প্রবীন স্বজন সদস্যরা নিজ মেধা ও মননশীলতায়, দক্ষতা-যোগ্যতায় অনন্য উদাহরণ তৈরী করছেন নিরন্তর। সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে পুরুষের পাশাপাশি মহিয়সী নারী, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নামও উচ্চারিত হয়। নারী দিবসের এই সুযোগে তাদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত শীরে।

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক ইতোমধ্যে গায়ক, নাচক বা বাদকের সাংস্কৃতিক দল গঠন করে আত্মবিশ্বাসের জায়গা তৈরী করতে পেরেছে। ডাইরেক্টরী ছাপাতে বা অন্য কোন আনুষ্ঠানিকতায় আমরা সাহিত্য প্রকাশের ছোট ছোট প্রয়াস নিয়েছি। এবারই পূর্ণমাত্রার সাহিত্য সংকলন বের করার এই উদ্যোগ। আমাদের উদ্দেশ্য যাঁরা অফিস বা বাসায় অহর্নিশ ব্যস্ততার মাঝেও মনের তাগিদে কিছু সৃষ্টি করে চলেছেন, তাদের উৎসাহ দেয়া। আমার বিশ্বাস যারা ইতোমধ্যে স্বনামধন্য হয়েছেন বা স্বজনের মাধ্যমে

যাঁদের হাতেখড়ি তাদের লেখনি সকল অন্ধকার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। যাঁরা লেখা বা সম্পাদনায় শ্রম দিয়েছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে অভিবাদন। আমি আশা করি সুন্দরের দিকে এই পথচলা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সিনিয়র সচিব (অবঃ)

মহসচিব
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

মুখবন্ধ

চিরহরিৎ সেই পাখির নাম, যার রঙিন পাখায় ভর করে আসে স্বাধীনতা ও প্রগতি, চিরহরিৎ সেই নদীর নাম যার স্বচ্ছ নিটোল জলের প্রতিবিম্বে ভেসে উঠে চিরচেনা প্রাণপ্রিয় সব মানুষের মুখ, চিরহরিৎ সেই প্রকাশনা 'স্বজন' যার মাধ্যমে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের সদস্যদের মাঝে তৈরী হয়েছে বিনিসুতার এক অদৃশ্য বন্ধন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্মবোধ জাগ্রতকরণের মাধ্যমে একটি নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরী করা সহ দেশ ও জাতির কল্যাণে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে একটি আনুষ্ঠানিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে গঠিত হয় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার পর সকল সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুপরামর্শ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি স্বরূপ রোপিত আন্তরিকতার বন্ধনের ছোট চারা গাছটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে একুশ শতকের উপযোগী পেশাদার, দক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের সুষম ও স্থায়িত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তক্যাডার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ রাখতে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ বন্ধনকে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস 'স্বজন' প্রকাশনা। এ স্মরণিকা প্রকাশের পেছনে আপনারা যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও নিরলস শ্রম দিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সর্বশেষে এ প্রয়াসের যা কিছু সুন্দর তার কৃতিত্ব নেটওয়ার্কের সদস্যদের। আর অসুন্দর কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তার দায়ভার আমার। বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র অন্তরে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করবো, বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করবো এক অনন্য মহিমায় - এ প্রত্যাশায় .....

নাসরিন আক্তার
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত সচিব)
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

আহ্বায়ক
প্রকাশনা উপকমিটি
বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক

আহ্বায়কের কথা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ২৮টি আন্ত:ক্যাডারের মহিলা কর্মকর্তাদের কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে ওম্যান নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু হয়েছিলো ২০১০ সালে। যাত্রা পথের নানা চড়াই-উৎরাই, প্রতিকূলতা কাটিয়ে অষ্টম বছরে পদার্পনে করেছে ওম্যান নেট। নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে সদা সর্বদা প্রতিশ্রুতিশীল এই সংগঠনের সদস্য হিসেবে আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও উদ্বেলিত। অনতিদীর্ঘ এই পথ পরিক্রমায় ইতোমধ্যে 'স্বজন' এর চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ বছরের নারী দিবসের ভাবনা (২০১৮) ও স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর উৎযাপনের প্রাক্কালে স্বজনের 'সাহিত্য সংখ্যা' প্রকাশের উদ্যোগ নি:সন্দেহে এই সংগঠনের সাফল্য গাথায় নতুনভাবে যুক্ত হবে এক রঙিন পালক। সাহিত্য-সংখ্যার সকল রচনাই নেটের সম্মানিত সদস্যদের লেখনী থেকে নির্বাচিত।

নারী ও পুরুষের যৌথতায় গড়ে উঠেছে মানব জাতি। এই চেতনা ও সত্যতার প্রতিফলন রয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় "এ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। বর্তমান যুগের নারী কেবল ঘরের কাজে নয়, বাইরের জগতে বেড়েছে তার কর্মের দায়িত্ব ও ব্যাপ্তি। শিক্ষায়, মেধায়, সমাজজীবনে, কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনে তারা আজ অগ্রগামী।

বিশ্ব সভায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশ্ব জুড়ে নানা কর্মসূচিতে বিশেষ এই দিনটি আনন্দের সঙ্গে উৎযাপন করা হয়। আমরা বিশ্বাস করি এই আনন্দ উৎসবে নেটের নারী কর্মকর্তাবৃন্দ সমান অংশীদার। এই আনন্দময় ভাবনার গভীরতর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আমাদের "স্বজনসাহিত্য সংখ্যা" প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

ওম্যান নেটের প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মানিত সভাপতি সুরাইয়া বেগম এনডিসি, সম্মানিত মহাসচিব নাসরিন আখতার এর যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায়

আগামীদিনে নতুন নতুন কর্মসূচি নিয়ে নারী-বান্ধব এই সংগঠন এগিয়ে যাবে বহুদূর। নেটের পতাকাতলে আগামী দিনের নারী কর্মকর্তাবৃন্দ উন্নত কর্ম-পরিবেশে নিশ্চয় খুঁজে পাবে তার কাঙ্ক্ষিত সময়ের এক নতুন আলেখ্য- যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ আর সম-অধিকারের বিজয়।

এই প্রকাশনার কাজের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মকর্তাকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে স্বজনের সাহিত্য সংখ্যার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

প্রফেসর ড. দিলারা হাফিজ
সহ-সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
কবি, গবেষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

সমতা

নাছিমা বেগম এনডিসি

নারী-পুরুষ সমতা আজ বিশ্বসভার দাবী
তাদের হাতেই স্বপ্ন বোনা উন্নয়নের চাবী।
তাইতো এখন চাইছে সবাই
নারীর ক্ষমতায়ন।

পরিবার সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থায়
নারী-পুরুষ দু'জনে দুজনার সহায়।
সন্তানকে লালন করা মায়ের বড় কাজ
বাবার সাথে মায়ের নামও প্রতিষ্ঠিত আজ।
নারী-পুরুষ দু'জন মিলেই
করবো উন্নয়ন।

নারী ছাড়া পুরুষ অচল, পুরুষ ছাড়া নারী
নারী-পুরুষ দু'জন মিলে সুখের জীবন গড়ি।
নারী-পুরুষ সমান সমান নয়কো বড় ছোট
বিশ্বব্যাপী শোর উঠেছে সবাই জেগে ওঠো।
নারী-পুরুষ দু'জন মিলেই
গড়বো এ ভুবন।।

কবি পরিচিতি
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মেঘ বরণ কনে

আকতারী মমতাজ

ময়ূরকণ্ঠি রাতের কনে বৌ তুমি
বিষাদের রঙে কেন সাজলে বলো?,
শুনেছো কি কলতান
জোয়ার এল ঐ, জোয়ারের আহ্বান
দুকূল ভাসলো জলে
এইতো দিন ভাসবার, ভালবাসবার।
অপেক্ষার পানসী প্রহর গনে
ভাসবে জোয়ারে, ভাসাবে দোহারে।
তুমি পা রাখলেই নায়ে
পালে লাগবে হাওয়া
ভরা জোয়ারে, ভরা জোছনায় বাজবে বাঁশি
এইতো চেয়েছিলে তুমি
গেয়ে ছিলে গান।

তবে আজ আনন্দ ভেরী কই?
কেন মেঘবরণ তুমি, মেঘলা আকাশ
বিষাদ মাখা ও'মুখের ছায়া
ছুঁয়েছে নীলাকাশ, যমুনার নীল, গোঁধুলির মায়া।

সাত আকাশের মেঘের রঙে সেজেছো সূর্যমুখী !
সূর্য কোথায় ? সূর্য কোথায় ?
আঁধার আলোয় দেখি
নীল যমুনায় রাতের আকাশ
তারার ফুলের মেলা
তারা তো নয়, তারা তো নয়
কালো কেশে আগুন আগুন খেলা
পোড়া গন্ধে কাঁপে বাতাস
স্বপ্ন পোড়ার বেলা !

কবি পরিচিতি
সচিব
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

উড়ন্ত বর্ষার ফলা

দিলারা হাফিজ

উড়ন্ত বর্ষার ফলার মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর তুমি
এসেছিলে উনিশ শো একাত্তরে
মাটির মুক্তির সোনালি ফলায়;
যুদ্ধের সভায়, উন্মুক্ত দামামা বাজিয়ে,
রক্তবীজের পতাকা উড়িয়ে মোহনীয় ভঙ্গিতে
এসেছিলে তুমি এদেশের মাটি ও মানুষের
গভীর প্রত্যয়ে;
আমি তখন সবে আঠারোতে পা রেখেছি
আমাকে ঘিরে যৌবনের উত্তাল ঢেউ
পরাবাস্তব রৌদ্র ছায়ায় শব্দের বেসামাল উচ্ছ্বাস
আমাকে দিয়েছিলো রাজহংসের গ্রীবার মতো অহংকার,
লাবণ্যে চোখ রেখে হেসে উঠতো সহপাঠী সময়
আড় চোখে দেখে নিতো যে কোনো বয়স;

তখন আমি কী ছিলাম যুদ্ধের মাপকাঠি?

ননীভাই আমার বাচনভঙ্গীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ,
বাদলভাই দূরে থেকেও অনুসরণ করে চোখে চোখে
মুক্তিযুদ্ধের বারতা বয়ে আনে গোপন পোস্টারে
সাতই মার্চের ভাষণের খসড়া ওড়ে পুবালি বাতাসে
কিন্তু আমি যার চোখে তাকাতে চাই, সে তাকায় বহুজনে,
তর্জনীর দৃঢ়তায় কেঁপে উঠি বিস্ময়ে
অকস্মাৎ ফিরে আসি নিজের কাছে,
আত্মনিবেদনে জেগে উঠি দেশপ্রেমে;

তখন আমি কী ছিলাম মুক্তির মাপকাঠি?

হঠাৎ দেবেন্দ্র কলেজ বন্ধ ঘোষণা আসে,
আমরা ঢুকে পড়ি যে যার ব্যাংকারে----
আধা মাইল পায়ে হেঁটে চলে আসে
সহপাঠী বন্ধু আমার চাঁন মিয়া
কেরাম খেলাচ্ছলে অনবরত গল্পের আধার
ভালোবাসার গল্পের চেয়ে ও তা অতিশয় গোপন,
দিনের বেলা সে আমার খেলার সঙ্গীসুতো
রাতের অন্ধকারে দুর্ধর্ষ মুক্তিকামী দেশ প্রেমিক

তখন আমি কী ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা?

গোপন আস্তানায় তার খবর রটে যায়,

বসে থাকি আমি তার আশায় আশায়
রাতের আঁধারে আসে দুদিন উপোষে থাকা
অপর মুক্তিযোদ্ধার দল,
মনে পড়ে বাবা কীযে ব্যস্ত হয়ে যেতেন সেইসব দিনে
খুব সংগোপনে মা রাঁধতে যেতেন,
কাজের লোক বিদায় করে,
ভোরের আলো না ফুটতেই
তারা গোপনে চলে যেতো অন্যত্র,
বাজী রেখে নিজের জীবন,
এবং অন্নদাতার নিরাপদ ভুবন

তখন আমি কী ছিলাম দেবী অন্নপূর্ণার প্রাণ?

কচু পাতায় পানির মতো গড়িয়ে পড়ে ভয়
একদিন ত্রাস গলিয়ে এ, কে ফোরটি সেভেন
ঠিকই ঢুকে পড়েছিলো গাঁয়ের নির্জনে
গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে সোঁদা মুহূর্ত মাটির
তখন বর্ষাকাল, পাটক্ষেতের অন্ধকার আর
ডুবোজলে লুকাই নিজেদের
কণ্ঠা জাগিয়ে জলে দাঁড়িয়ে থাকি যেন জলের যমজ
কাঁধে দুই বছর বয়সের ছোট ভাই;
গর্ভবতী মা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে তখন একা দরজায়,
যেন দশভূজা দূর্গা এক;

তখন আমি কী ছিলাম আপনা মাংসে হরিণা বৈরী

বিজয়ের ফুল্ল পার্বনে আসে উৎসবের দ্যুতি
চারদিকে আনন্দ ধ্বণি ফোয়ারার মতো ছোটে
আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে
ছি বুড়ি খেলতে খেলতে খেলতে খেলতে হঠাৎ
ছুঁয়ে ফেলি চাঁন মিয়ার রক্তাক্ত লাশ
বাংলাদেশ ফিরে আসে শহীদের কফিনে
ও বন্ধু আমার

এক চোখে জল, অন্য নয়নে বিজয়ানন্দ সজল।

কবি পরিচিতি

কবি, গবেষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
সহ-সভাপতি, বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক
সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
আইসবোট টেরেস, টরন্টো
১৭/১১/২০১৭

বাইরে এবং ঘরে

মাজেদা রফিকুন নেছা এনডিসি

মা বলেছেন, "কাজ করে যাও সারা জীবন ধরে,
যে কোন কাজ করার সময় করবে যতন করে,
কষ্ট করে চেষ্টা করে ভীতটা নিও গড়ে
কঠিন কাজে ভয় পেয়োনা, যেওনা যেন সরে",

বাবাও বলেন, "কাজ করে যাও বাইরে এবং ঘরে,
কান দিওনা কারও কথায় দোষ যদি কেউ ধরে।
মেয়ে মানেই বন্দী গৃহে? বাইরে যাওয়া বারণ তার?
মুখটি বুজে সহ্য করা শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচার?
কক্ষনো নয়, জীবন কাটাও বাইরে ঘরে কাজ করে
অলস হলেই দুঃখ পাবে, বাকী জীবন ঝরঝরে।
নারীতো নয় ফেলনা কোথাও বাইরে কিবা সংসারে,
কেন নারী কাল কাটাবে ভাল থাকার ভান করে"?

বাবা মায়ের কথায় আমি বাইরে ঘরে কাজ করি,
উপার্জনের টাকা দিয়ে সংসারেতে হাল ধরি।
লেখাপড়া ট্রেনিংগুলো কাজে লাগাই এই ভাবে,
কারও কথার ধার ধারিনা, যার যা খুশী তাই ভাবে।

দীর্ঘ সময় বাইরে থাকি অল্প সময় ঘরে,
একলা ঘরে বাচ্চাগুলো, মনটা কেমন করে,
ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেলে চোখের পানি পড়ে,
গাড়ীর চাকা আটকে গেলেও ঘড়ির কাঁটা নড়ে।

জ্যামের সাথে যুদ্ধ করে বাসায় ফিরে আসি,
তবুও আমি কাজগুলোকে ভীষণ ভালোবাসি।
বস কলিগের চোখ রাঙানি খারাপ কথার পরও
সামলে চলি অফিসটাকে সামলে চলি ঘরও।

বুদ্ধি করে সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলি।
সগৌরবে নারী জাতির জয়ের কথাই বলি।

কবি পরিচিতি
সাবেক রাষ্ট্রদূত

মা, তোমার কুসুম মুখচ্ছবি

লুৎফুন নাহার বেগম

কুসুম তোমার মুখচ্ছবি এঁকে যাই কুয়াশা পালকে
আমি দিকভ্রষ্ট আলোহীন, হাঁটতে হাঁটতে
পার হয়ে এলাম কতো দীর্ঘ পথ, ফিরে এসে দেখি
তোমার শাদা শাড়ির পাড় ঘিরে বসেছে নক্ষত্র মেলা
বালিকা তোমার জরায়ুর ঘ্রাণে দিয়েছো শুশ্রূষা
মগ্নতার শরীর ছেনে ঢেকেছো রক্ত বীজ তপস্যার আড়ালে
জন্মাবধি তাই তোমার উষ্ণ আঁচলে ঢাকি
কবন্ধ শরীর, পরাজিত ছায়া, অবসন্ন পাখা।
তুমি জ্যোৎস্নাবতী মেয়ে জলজ অন্ধকার মুছে
করতলে তুলে রাখো বিমল উত্তাপ
তোমার শরীর ছুঁয়ে, তোমার ওমের আড়ালে হেঁটে
পরিত্রাণ খুঁজি আধাঁরে
আমার অন্তিমে খুঁজি তোমার পবিত্র মুখ।

কবি পরিচিতি
যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

চেয়েছি পাখির জীবন

নাঈমা হোসেন সুবর্ণা

পাখির জীবন চেয়েছি বারবার.... পাইনি
আজ জীবনের মধ্যাহ্নে এসে
পাখি হয়ে ছুঁয়ে গেলাম তোমার আকাশ!
ভিন্ন দেশ, ভিন্ন দ্রাঘিমায় এসে আবিষ্কার করলাম
জগতে যা কিছু মানুষের পাবার...
তা সে পাবেই;
আর যা কিছু হারাবার,
তা সে পাবেনা কোনোদিন!

দূর কোনো পল্লী হতে ভেসে আসা মৃদু মাদলের সুর
মহুয়ার মাতাল গন্ধ
ফেলে আসা উদাসী কোনো বসন্ত সন্ধ্যার টুকরো স্মৃতি
একটি দ্বিধান্বিত অবয়ব.....
তোমাকে ঠিক এভাবেই মনে পড়ে আজও আমার!
মনে আছে? আমাদের কথা ছিলো
জারুল, পলাশ, কদম-কৃষ্ণচূড়া ফোটা
মায়াবী সেই পথে হেঁটে যাবার;
কথা ছিল, অলস কোনো দুপুরে ক্লাস শেষে
সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর একপ্রান্তে
ভালোবাসার পাঠ নেবার!
কথা ছিল টি.এস.সি.কলাভবন, লেকচার থিয়েটার,
মধুর ক্যান্টিন, ডাস কিংবা ফুলার রোডে
একসাথে চলবার....!
কিন্তু কিছুই হয়নি.....
আমরা কোনোদিন হেঁটে যাইনি স্বপ্ন বিছানো পথে
গভীর গহন অনুভূতিতে কোনোদিন
বলা হয়নি 'ভালোবাসি'!
ফুটবার আগেই ঝরে পড়া বকুল যেন!
আজ পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে
বলে গেলে তুমি.....
এ জীবনে যে পথে চলিনি আমরা,
যে স্বপ্ন, থেকে গেছে স্বপ্নেই....

জীবনের ওপারের যে জীবন
দেখে নিও তোমার আগে সেই জীবনে গিয়ে
অপেক্ষায় থাকবো আমি....
কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয় বা
অন্য কারো অনুভূতির ছায়া
ম্লান করবেনা আমাদের ভালোবাসা!
যা কিছু হারিয়েছিল তোমার দ্বিধায়
আজ তা ফিরিয়ে দিলে অনুশোচনার ভাষায়!

কবি পরিচিতি
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

আমার প্রাত্যহিকতা

সুলতানা ইয়াসমীন

একদিন, খোলা আকাশের নীচে তোমাকে জড়িয়ে চুমু খাবো, একদিন চন্দনের বনে
তোমার হাত ধরে হাঁটবো,
একদিন, ভরা পূর্ণিমায়,
তোমার কপালে তিলক আঁকবো চাঁদের।
একদিন জ্যামবিহীন রাস্তায়
তোমার সাথে রিকশায় ঘুরবো, সেদিনের বাকী পথটুকু।
একদিন, ঠিক একদিন দেখো,
কুয়াশায় তোমার সাথে চাদর ভাগাভাগি করে বসে রইবো জোছনায়,
একদিন জেগে উঠে তোমার ঘুমন্ত চোখের পাতায় চুমুতে চুমুতে ভরে দেবো ভীষণ,
একদিন খুব ভোরে উঠে তোমাকে নিয়ে
চলে যাব দূরে কোথাও
তোমার গায়ে আমার ঘ্রান মেশানো সেই পাঞ্জাবীটা
আর আমার পরনে থাকবে সেই শাড়ীটা,
যে জমিনে তোমার গন্ধ মিশে আছে ব্যাকুলভাবে।
একদিন খুব ব্যস্ততা দেখাবো তোমাকে
বাবুটাকে তোমার কোলে দিয়ে বলবো,
"একটু রাখো তো সোনা কে, আমি আসছি"
একদিন, কোনো কোনো দিন, সারা দিনমান
শুধু তোমার সঙ্গে থাকবো,
বর্ষার ছুটির সেই দিনে
তোমার সঙ্গে আমাদের প্রিয় গানগুলি শুনবো আমরা, কেমন? একদিন, সারাদিন শুধু
তোমার ছোটখাটো কাজ করে দেবো, পুরোনো জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবো তোমার,
ধুলোপড়া প্রয়োজনীয় টুকিটাকি মুছে তুলে রাখবো।
একদিন আমি পুরোটা তোমার হবো
একদিন তুমি পুরোপুরি আমার হবে
সেইদিন তোমায় জড়িয়ে সুখের কান্না কাঁদবো
আবার প্রথমদিনের মতো।
কী যত্নে রেখেছি তোমার নাম!
তেমনি যত্নে তোমায় ভালোবেসে যাব, দেখো!

লেখক পরিচিতি
উপসচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

বাদলা দিনের প্রেম

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

তোমায় নিয়ে ভালোবাসার ঘর বেঁধেছি
তাই বলে এই বাদলা দিনে কষ্টে আছি।
রাত দুপুরে গভীর ঘুমে বুকের মাঝে মাটির পাহাড়
তবু আজ স্বপ্ন-আশায় বেঁচে আছি।
মেঘের পরে মেঘ জমেছে; বর্ষা-রানীর ঘুম ভেঙেছে
বাদলা দিনের তুফান হাওয়ায় প্রেম কি আমার ভেসে গেছে!
মেঘ কেটেছে মেঘ কেটেছে উঠোন জুড়ে রোদ হেসেছে
ঘাসের ডগায় হীরের কণা তোমার চোখে ঘুম এনেছে
মেঘের ভেলায় ভেসে ভেসে ঘুম কুমারের নাও
স্বপনপুরের দুয়ার ভেঙে আমায় নিয়ে যাও
বৃষ্টি শেষে আলো ছায়ায় কোথায় তোমার দেখা পাই
রৌদ্র দিনের অবুঝ প্রেমে আজকি আবার বান ডেকেছে!
আকাশ পাড়ের সাতরঙ্গা সুর মাতিয়ে রাখে তপ্ত দুপুর
ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসিয়ে হারিয়ে যেতে অনেক দূর
ইচ্ছেগুলো হয়না রাঙ্গা যেমনটি চাই তোমার কাছে
ভাবনা শুধু ভালোবাসা কথামালায় হারিয়ে গেছে!

কবি পরিচিতি
সহযোগী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ
ঢাকা

নস্টালজিয়া

ড. হোসনে- আরা বেগম মার্জনা

এই নীরেট পাথুরে নগরীর বারন্দায় দাঁড়িয়ে
আমার নিঃশব্দ, নীল ফরিয়াদ!
বুকের ভেতর শরাহত পাখির উড়াল,
আমি উড়ে চলে যাই-
হেমন্তের মেঠোপথ পাড়ি দিয়ে
নীল- সাদা সালোয়ার কামিজ পরা
কিশোরীর দলে।
সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া শালুকের বিলে
শাপলার মালা গাঁথি,
কচুরি পানার নরম তুলিতে
এঁকে চলি আমার কিশোর বেলা!
হিজল ফুলের প্রশান্তির পাপড়ি মাড়িয়ে
ভোরের পাখিটার সাথে
লুকোচুরি খেলি,
আমাকে হাতছানি দেয়-
সবুজের মায়ামাখা আমার নিজস্ব ভূ-গোল
আমার 'অনুরাগ' গ্রাম!
তীর ভেঙে বয়ে চলা
সুগন্ধার ঘোলা পানি,
জীর্ণ ইটে গাঁথা স্কুল ঘরটি
অকটোপাশের মতো,
বেদনার অনেকগুলো হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
দু'পাশে রাত্রির ছায়া নিয়ে
মৃত্যুর কফিন জড়িয়ে
শুয়ে আছেন আমার বাবা,
একা! ভীষণ একা!!
একদিন যে ছিল আমার
জীবনের প্রেরণা,

আজ সে স্বপ্ন, ছায়া!
এইসব ব্যথা কাতরতা
আর নস্টালজিয়া আঁচলে জড়িয়ে
আমি জেগে থাকি তন্দ্রার ভেতরে।
এরাই তো আমার নাগরিক
দিন রাত্রির কান্তি মুছে দেয়।

কবি পরিচিতি
সহযোগী অধ্যাপক
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সরকারি মহাবিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা

বাবু'দা

রাবেয়া বসরী (রেবা আফরোজ)

ও চারবাক! ও সন্ধি!!
এইখানে আয় গাছের ছায়ায়
নিরিবিলি বসি কিছুটা সময়
নীরব অশ্রুপাতে মন, যদি শান্ত হয়।
জানি, পিতা গেছে তোর
বুকের পাঁজরে তার রেখেছিল সে -পুত্রদ্বয়।
আমারও কম কিছু নয়
ভালোবাসতাম তাকে কতখানি
বুঝি নাই হারাবার আগে।
মাঝে গেল বারোটা বছর
মুঠোফোনের যুগ নয় সেটা
তাই বুঝি হারালে আর
খুঁজে পাওয়া যায় না সহসা।
এসব জানি অসত্য শোনাবে আজকাল।
শুধু মনে মনে খুঁজতাম তাকে
চঞ্চল চোখের তারায়।
পুনরায় পেলাম তাকে শাহবাগে
বইপোকা বলে বইয়ের দোকানে।
সেই দিনই নিয়ে গেছি বাড়ী
দ্যাখো তুমি- সাজানো সংসার।
কত খুঁজেছি তোমায়- কেন দ্যাখা হয় না আবার
কবিতা পাঠ, সঙ্গীতের ঘোরলাগা সুরের সন্ধ্যায়
অথবা, আসর কোনো বোদ্ধা আলোচনার।
বলেছে হেসে -জাহাঙ্গীরনগর গাছের ছায়ায়
মানুষেরা জানে বাবু'দা কোথায়।
ভুল হয়েছে জানি, যাবো যাবো করে হয়নি যাওয়া
জগত সংসার ততদিনে আমার
পায়ে পরিয়েছে শিকল সোনার।
তবু, ফিরলে নিয়ে নির্মল স্নেহের সুধা
তুমি আসলেই সন্তানেরা উঠতো বলে
"মা, এসেছে তোমার দাদা"।

এখন অনুতাপে পুড়ছি আমি
জলের স্রোতে যাচ্ছে ভেসে দুই গাল
তোমাকে হয়নি দেওয়া উজ্জ্বল ক্ষণকাল।
হয়তো কাটানো যেত আরো কিছু সঘন সময়
এই গ্রহলোকে, এত মানুষের ভীড়ে
প্রিয় মানুষের মুখ আর তার ছায়া
গন্ধ এবং বাণী, উচ্চারিত শব্দের মঞ্জরী
ভালোলাগার ঘোর এনে দেয়।
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় থাকে যে, শুধু জানে সে
কতটা আরাধ্য তা, কতটা দামী।

কবি পরিচিতি
সিনিয়ার সহকারী সচিব
বিসিএস ২৭ ব্যাচ (প্রশাসন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নারী তুমি

ফৌজিয়া আখতার

রোকেয়াতে পড়েছি কতটাই অবরুদ্ধ ছিলে তুমি,
রুদ্ধ ছিল দ্বার।
একবিংশ শতকে তুমি কেনো রুদ্ধ তবে ?
নারী, তোমার হাত রুদ্ধ, পা রুদ্ধ, কান রুদ্ধ, রুদ্ধ তোমার শব্দ ভান্ডার।
বলায় রুদ্ধ, চলায় রুদ্ধ, রুদ্ধ তুমি মনে প্রাণে...
রুদ্ধদ্বার থাকবে যদ্দিন ভালবাসার অফিসে বোকার স্বর্গেই তোমার বাস
চোখ থাকতেও অন্ধ তুমি, বধির তুমি, মাননা তুমিই শ্রেষ্ঠ কালা।
ধর্ম কর্ম সবই তোমার, যেমন তোমার বাচ্চা পালন-ঘর-সংসার গেরস্থালি।
নষ্টা তুমি, ভ্রষ্টা তুমি, তুমিই যখন নির্যাতিতা।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি বাংলা হিন্দি সিরিয়ালে নিবিষ্ট তোমার চিত্ত তখন।
শোনো তবে,
নতুন করে যোগ হয়েছে এখন তুমিও যে অর্থদাতা।
হাসছ কেনো ?
তুমিইতো চাও হতে মেঘে ঢাকা তারা।
সত্য বলছি, শোনো তবে- হো হো যখন হাসতে মানা,
যুক্তিতর্ক তোমায় মানায় !
না না না, তা হবেনা।
মুখরা নাম সবই তখন তোমার জেনো...

কবি পরিচিতি
উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর)
বিসিএস (কৃষি)

রায়ান

শারমীন আক্তার

যুগ হতে যুগান্তরে চলছে যে অনিয়ম,
কে থামাবে তাকে বলো গড়বে কে সুশাসন?
চারিদিকে এত অশান্তি, এত যে অবক্ষয়
কে করবে নিঃশেষ, শান্তির বাতাস কি বয়?
এসবে এক নতুন ক্ষণ, নব জাগরণ,
সবাই হবে একজোট, এক রাজার পণ।
হাতে হাত, তালে তাল চলবে একসাথে
জয় কিংবা পরাজয়- ভয় নেই তাতে।
সবাই মিলে আনবে সূর্য, নতুন ভোরের দিশে
ধনী- গরীবের ভেদ নয়, থাকবে মিলেমিশে।
রাজার নামটি সবাই মিলে করছে সন্ধান
সে যে আমার সোনামণি শাহীর তাজওয়ার রায়ান।

কবি পরিচিতি
উদ্যানতত্ত্ববিদ, বিসিএস (কৃষি)
৩২ তম বিসিএস
পাটগাছিয়া হর্টিকালচার সেন্টার, ফেনী

আপন আলোয়

রাধু বড়ুয়া চৌধুরী

কে? হে- তুমি নারী!

স্তব্ধতা, নীরবতায় নিজেকে খোঁজা
জানার উচ্ছ্বাস, চেনার প্রয়াস,
ভোরের আলোর মতো আপন আলোয়,
মনের আলোয় নিজেকে দেখা।

ব্যস্ততার ভীড়ে, নিজেকে ভুলে
সবার চাওয়ার চিন্তা নিয়ে,
এখানে-সেখানে নিরন্তর ছুটোছুটি,
কি? কোথায়? কেন? কখন?
এসব ভেবে সময়ের কাটাকাটি।

এভাবে কেটে যায় দিন-মাস
হয় না নিজের সাথে একটু বসবাস।
তবু- বেঁচে থাকার 'এই পাওয়া'
সবার সাথে আপন প্রভায়।
মাঝে মাঝে নিজেকে খুঁজে দেখা,
নিজের মতো বাঁচা, নিজের ইচ্ছায়।

কবি পরিচিতি
২৪তম বিসিএস
সহকারি অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা
কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার

উপলব্ধি

ফারজানা বিলকিস

মিলে না মিলে না হিসেবের খাতা জীবনের
আর কতবার মৃত্যু হবে স্বপ্নের।
যতই মিলাতে চায়, ততই ফেলি গুলিয়ে,
ওগো দয়াময়, মাবুদ আল্লাহ, দাওনা হিসেবটা একটু মিলিয়ে।

ভাবি যতবার নতুন করে করবো শুরু পথচলা
কণ্টকাকীর্ণ পথ আমার, নয়তো পিচঢালা।
মতনটা আমার ডুবে যায় তাই ঘন কালো আঁধারে
হাতটি ধরে দেখাবে কে পথ, অস্থির, চঞ্চল এই আমারে।

আর কতবার হোঁচট খাবো, পথ হারাবে জীবনে
পথহারা হয়ে খুঁজবো তোমায় শয়নে ও স্বপনে।
তোমার সৃষ্টি; তোমার বান্দা, তুমিই শেষ আশ্রয়
ভুল করলে ক্ষমা করো, হেরে গেলে দিও জয়।

দুহাত তুলেছি, সেজদায় পড়েছি, চোখ ভরেছি অশ্রুতে
ফিরায়ে দিবেনা এ বিশ্বাস আমার, সন্দেহ নেই তাতে।
তাই আজ দৃঢ় বিশ্বাসে চাইছি ওগো দয়াময়
ভুল যা করার করেছি, আর যেন তা না হয়।

কবি পরিচিতি
প্রভাষক, ইতিহাস (ব্যাচ- ২৯ তম)
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়
উত্তরা, ঢাকা

ঘুরে এলাম ভারত মহাসাগর

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন

আমি সাহিত্যের ছাত্রী নই। লেখালেখির অভ্যাসও আমার তেমন নেই। তবে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। চাকুরী সুবাদে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে এই সফরগুলোতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, সভা নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে, দেশটাকে দু'চোখ জুড়ে দেখার তেমন সুযোগ থাকে না। তাই বরাবরই আমার ভাল লাগে ব্যক্তিগতভাবে বিদেশ সফর। এ বিষয়ে আমার চিরসঙ্গী মোকতাদির চৌধুরীও যথেষ্ট উৎসাহী একজন মানুষ। ২০১৬-এর মাঝামাঝি দীর্ঘ ৩২ বছরের বর্ণাঢ্য সরকারি কর্মজীবনের অবসান ঘটলে বিষন্নতা আমাকে যেন পেয়ে না বসে তার জন্য মোকতাদির আগেই ব্যবস্থা করলেন ভূটান ভ্রমণের। সত্যি পাহাড়-ঝর্ণা-নদীর সমন্বয়ে ভূটানের অপরূপ সৌন্দর্য আমার বিষন্ন ঘেরা মনটাকে মুহূর্তেই আনন্দে উদ্বেলিত করলো।

তবে আজকে আমার ভ্রমণ কাহিনী ভূটানকে নিয়ে নয়। আফ্রিকার এমন তিনটি দেশের ভ্রমণ কাহিনী লিখব যেখানে সচরাচর বাঙালী পর্যটক কমই গিয়ে থাকেন। গত বছর জুনে সংসদ শেষ হওয়ার আগেই আমার চির সঙ্গীটি ঘোষণা দিলেন, 'এবার ভ্রমণে সারপ্রাইজ আছে, আমরা মরিশাস যাচ্ছি'। হিন্দি সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় শুটিং স্পট মরিশাস। মালদ্বীপ গিয়েছি-- সারা জীবন মনে রাখার মত। তাই ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি আমাকে সবসময় আকর্ষণ করে। খুব উৎফুল্ল মনে দিনগুনছি সেপ্টেম্বরে যাব। মরিশাস যাওয়ার জন্য বোম্বে থেকে আমরা যে রুট বেছে নিলাম তাতে আমাদের ভ্রমণ বিলাসে আরও যুক্ত হলো মাদাগাস্কার ও সিসেলস। ম্যাপ দেখে একেবারে মহাসাগরের বুকে মরিশাস ও সিসেলস আইল্যান্ডে যেতে একটু একটু ভয়ও করছিল। কিন্তু ভ্রমণের পর মনে হয়েছে মরিশাস ও সিসেলস বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।

মরিশাস

ভারত মহাসাগরের বুকে মাত্র ২০৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে দ্বীপমালা বিশিষ্ট দেশ রিপাবলিক অব মরিশাস। যাকে বলা হয় 'ভারত মহাসাগরের নক্ষত্র ও চাবি'। কী যে অপরূপ চারিদিকে অথৈ নীল জলরাশি, তারই সাথে কোথাও পাহাড়--- এ যেন বিধাতার হাতে সাজানো পৃথিবীর স্বর্গ। সাদা বালুকাময় মহাসাগর তীরে নীলাকাশ, নীল জলরাশি যেন এক হয়ে মিশে গেছে। উত্তর দক্ষিণের সৌন্দর্য ভিন্নরকম, কোথাও সাত রঙের ভূমি, রয়েছে মৃত আগ্নেয়গিরি। প্রায় আশি লক্ষ বছর আগে প্রাগৈতিহাসিককালে মহাসাগরে পানির নীচে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে

হাজার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে যে ভূমির সৃষ্টি হয়--- তা-ই বর্তমান মরিশাস। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৩০০-৮০০ মিটার উচ্চতায় রয়েছে পাহাড়। জনসংখ্যা মাত্র ১২/১৩ লক্ষ। রাজধানী পোর্ট লুইস। মরিশাস ও রডরিজ দ্বীপ নিয়ে মূলত ঃ মরিশাস রিপাবলিক। সমগ্র দ্বীপের ১৫০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে সাদা বালুকাময় বীচ--- যাকে ঘিরে রেখেছে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর।

মরিশাসে ভারত মহাসাগরের তীরে লেখিকা ও মোকতাদির চৌধুরী

পোর্ট লুইসের পুরনো শহরে আমরা যে রিসোর্টটিতে ছিলাম তা একেবারে মহাসাগর তীরে। জেটির সাথে রুম দেয়ায় আমরা তা পরিবর্তন করে নতুন কটেজ নিলাম--- যার দরজা খুললেই দিগন্ত জোড়া নীল জলরাশি। রিসোর্ট থেকে স্পীড বোট দিয়ে যেতে হয় শহরে। এখানে রয়েছে সিনেমা হল--- যেখানে সব সময় হিন্দি ছবি চলে। খুব মজা লাগল আমার প্রিয় বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের বড় পোস্টার দেখে। শুনেছি নতুন শহরের সাগর তীরের সুন্দর সুন্দর শূন্য ভিলাগুলোর অধিকাংশই বলিউড তারকাদের।

মরিশাস প্রথমে ডাচ, পরে ফ্রেঞ্চ ও সবশেষে বৃটিশ কলোনী ছিল। দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৬৮ সনে। ১৫৯৮ সনে একজন ডাচ নাবিক প্রিন্স মরিস ভ্যান নামাও-এর নামানুসারে দ্বীপটির নামকরণ করা হয় মরিশাস। দেশটি বহু ভাষাভাষি, বহু জাতিক, বহু ধর্মীয় এবং বিবিধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সমৃদ্ধ একটি দেশ। মাত্র ষোল শতকে ডাচরা প্রথম মরিশাসে জনবসতি গড়ে। সে সময় ভারত থেকে দাস হিসেবে আখ বাগানে কাজ করার জন্য প্রচুর দাস নিয়ে আসা হয়। ১৮৩৫ সনে দাস প্রথার অবসান ঘটে। বর্তমানে মরিশাস হলো আফ্রিকার একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখানে হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী থাকলেও সংবিধান প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। দুর্গাপুজা এখানকার অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আমাদেরও সৌভাগ্য হয়েছিল নবমী'র দিন পূজামন্ডপে উপস্থিত থাকার।

একসময় আখচাষ মরিশাস অর্থনীতির প্রধান উৎস হলেও দাস প্রথার অবসান ও মরিশাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ধীরে ধীরে পর্যটনকে প্রধান উৎস করে তোলে।

নবমী'র দিন পূজামন্ডপে

স্বাধীনতা পরবর্তী মরিশাস ট্যুরিজম, টেক্সটাইল, সী-ফুড দিয়ে অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ হাজার প্রবাসী এখানে আছেন--- যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। এরা প্রায় সবাই গার্মেন্টস কর্মী। দেশটির মাথাপিছু আয় ১৬৮২০ মার্কিন ডলার। ১ অক্টোবর রবিবার আমি ডলার ভাঙাতে ব্যাংকে গিয়ে দেখলাম হাজারো গার্মেন্টস কর্মী দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে ব্যাংকে ভিড় করেছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে গেল। তাঁরা দেশকে সমৃদ্ধ করছেন---আমরা সেই কষ্টার্জিত অর্থ বিদেশে নিয়ে খরচ করছি!

যারা সাপকে ভয় পান, তাদের জন্য মজার তথ্য হল এখানে সাপ নেই। ভাষার দিক দিয়ে এরা ৮৪% ফ্রান্স- পর্তুগালের মিশ্র স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। তবে ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ হলো জাতীয় ভাষা। মরিশাসের অপূর্ব সৌন্দর্য, নীল মহাসাগরের গর্জন চিরকাল মনের স্মৃতিপটে ভাস্বর থাকবে।

সুপ্ত আগ্নেগিরির উঁচু ভূমি

রিসোর্টের নয়নাভিরাম দৃশ্য

মাদাগাস্কার

ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী পূর্ব আফ্রিকার বিস্তৃত আয়তনের দেশ হল মাদাগাস্কার। জীব বৈচিত্র্য ও হরেক রকম ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর জন্য বিখ্যাত এ দেশটির আয়তন ৫,৯২,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে বিশ্বে চতুর্থ বৃহৎ দ্বীপ রাষ্ট্র হলেও এটি একটি স্বল্পোন্নত দেশ। মাথাপিছু আয় মাত্র ৪০৫ মার্কিন ডলার। জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। রাজধানী আন্টানানারিভো। শহরের কোন কোন স্থান দেখে মনে হয়েছে

চল্লিশ বছর আগের পুরনো ঢাকা। বস্তির এই শহরে ফুটপাত ঘিরে গড়ে উঠেছে দোকান-পাট।

৪ অক্টোবর আন্টানানারিভো পৌছলেও হোটেলে ঢুকেই জানতে পারলাম দেশটিতে মহামারী আকারে প্লেগ চলছে। তাই শহরের নির্ধারিত এলাকা ছাড়া ঘুরে বেড়ানোর অনুমোদন পেলাম না। দর্শনীয় স্থান রয়েল প্যালেস, লেমুর পার্ক ঘুরে বেড়ালাম। রয়েল প্যালেস মেরিনা রাজতন্ত্রের স্মৃতি বহন করছে। সপ্তদশ শতকের শুরুতে রাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও ১৮৯৭ সনে ফ্রেঞ্চ কলোনী গড়ে উঠলে মেরিনা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং রয়েল প্যালেস ফ্রেঞ্চের দখলে চলে যায় এবং পরবর্তীতে তা মিউজিয়ামে পরিণত হয়। দেশটি ১৯৬০ সনে ফ্রান্স কলোনী থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

রয়েল প্যালেস

বিরল প্রজাতির লেমুরের সাথে লেখিকা

গাছপালা- জীব-বৈচিত্র্যের জন্য মাদাগাস্কার বিখ্যাত। সমগ্র বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ জীবের অস্তিত্ব এখানে দেখা যায়। শহর থেকে দূরে ন্যাশনাল লেমুর পার্কে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির লেমুর। প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া লম্বা লেজ বিশিষ্ট লেমুর দীর্ঘদিন মনে রাখার মত।

আগেই বলেছি এত বড় একটি দেশে (যার বাইশটি অঞ্চল ও ১১৯ টি জেলা) মহামারির ভয়ে শুধু মাত্র রাজধানী ঘুরে তার পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা যায়না। তাই ইচ্ছে আছে জীব-বৈচিত্র্যের এই দেশটিতে আবার যাওয়ার।

সিসেলস

ভারত মহাসাগরের বুকে মাদাগাস্কার থেকে উত্তর পূর্ব এবং কেনিয়া থেকে ১৬০০ কিঃ মিঃ পূর্বে ১১৫ টি দ্বীপ নিয়ে ৪৫০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট একটি দেশ সিসেলস। অধিকাংশ দ্বীপে জনবসতি নেই। রয়েছে গ্রানাইট ও প্রবাল দ্বীপ। শুধুই নীল জলরাশি, নারিকেল গাছ, সাগরতীর ঘেষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তা। কী যে

অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। সমগ্র সিসেলশ মেরিন ড্রাইভ দিয়ে ২/৩ ঘন্টায় ঘুরে আসা যায়।

মরিশাস অপূর্ব, মাদাগাস্কার জীব-বৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তিনটি দেশের মধ্যে আমার সবচাইতে ভাল-লেগেছে নীল জলরাশির মধ্যখানে শান্ত, সুনির্মল এই সিসেলসকে। রাজধানী ভিক্টোরিয়া। দেশটি'র ২৬টি জেলা, সংসদ সদস্য সংখ্যা মাত্র ৩৩, জনসংখ্যা নব্বই হাজার। মাথাপিছু আয় ১৭ হাজার মার্কিন ডলার। মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে দেশটির অবস্থান আফ্রিকার শীর্ষে। অর্থনীতির মূল ভিত্তি প্রক্রিয়াজাতকৃত টুনা মাছ ও ট্যুরিজম।

একসময় ফরাসী ও পরে বৃটিশ উপনিবেশ থেকে দেশটি স্বাধীন হয়েছে ১৯৭৬ সনে। এখানে কোন আদিবাসী নেই। সকলেই বাইরে থেকে এসেছে। আফ্রিকান, ফরাসী, ভারতীয় ও চীনা বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠী এখানে রয়েছে। এখানে প্রথম জনবসতি গড়ে উঠার বিষয়ে কথিত আছে যে, জলদস্যুরা ছোট সুন্দর এই দ্বীপটিতে একসময় বারবনিতাদের নিয়ে এসে রাত্রি যাপন করত--- আর এভাবেই একসময় তাঁদের বংশোদ্ভূতদের দিয়ে জনবসতি গড়ে উঠে। ১৫-১৬ শতক পর্যন্ত এটি এশিয়া-আফ্রিকার বণিকদের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। ১৭৫৬ সনে ফ্রান্স একে কলোনী করে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর নামানুসারে এর নামকরণ করে সিসেলস।

জন্ম ইতিহাসে যে করুণ কাহিনীই থাকুকনা কেন বর্তমানে ছোট্ট এই দেশটি অর্থনীতি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইন-শৃঙ্খলা সর্বক্ষেত্রেই সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

মজার বিষয় হলো, এ দেশে সকল বয়স্ক নাগরিক পেনশনের আওতাভূক্ত। এমনকি প্রত্যেক পরিবারকে রাষ্ট্র থেকে আবাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। শহরে একই ডিজাইনের সুন্দর সাদা বিল্ডিং রয়েছে, সামনে বাগান--- যা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত।

সরকারের বরাদ্দকৃত স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন

আবহাওয়া অত্যন্ত চমৎকার। জুলাই-আগষ্ট শীতের মাসে তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রী পর্যন্ত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দেশের ৪২% ভূমি প্রকৃতির মত করেই রেখে দেওয়া হয়েছে। মহাসাগর আর প্রকৃতির অভূতপূর্ব মিলন দ্বীপকে অপরূপ করে তুলেছে। এর সবচাইতে সুন্দর বীচ হল বিউ ভ্যালন আইল্যান্ড ও ইডেন বস্নু আইল্যান্ড। আমরা ইডেনের ইডেন বস্নু হোটেলে ছিলাম। হোটেলের কক্ষ থেকে পাহাড়, নীল জলরাশি, সাগরের গর্জন--- কী যে অপরূপ!

দেশটির সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। তাই মেয়েরাই বেশি কর্মঠ। হোটেল, রেস্তোরাসহ সর্বক্ষেত্রেই মেয়েরা কাজ করছে। এদের সাথে কথা বলেও ভাল লাগল। এখানকার সাধারণ মেয়েরাও সমাজ ও রাজনীতিতে অত্যন্ত সচেতন। আরও অবাক লাগল এখানে প্রায় তিন হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী আছেন। যাঁরা রেস্তোরা, নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন পেশায় আছেন, ব্যবসাও করছেন কেউ কেউ। বেশ সফল ব্যবসায়ী পেলাম অন্তত: ৪/৫ জন। মোকতাদিরের পূর্ব পরিচিত নিজাম ভাই--- যাঁর সাথে প্রায় চল্লিশ বছর পর দেখা হল। তাঁর কৃষি খামার আমাদের মুগ্ধ করলো। বাংলাদেশের প্রায় সকল শাক-সবজিই এখানে চাষ হচ্ছে।

প্রবাসী বাঙালী নিজাম ভাইয়ের কৃষি খামার

এখানে বন্যা, সুনামী, ঝড় জলোচ্ছ্বাস বলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই। ভারত মহাসাগর এখানে অনেকটা শান্ত, সৌম্য রূপ। স্বচ্ছ, নীল জলরাশিতে বোটিং করা যায় সহজেই।

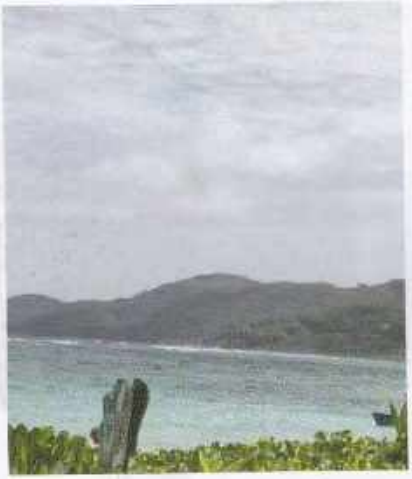

যেখানে মিশে গেছে পাহাড় আর সমুদ্র

'আবার আসিব ফিরে'--- এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেই এক মিষ্টি ভাল লাগা নিয়ে ফিরলাম প্রায় পনের দিনের সফর শেষে ঢাকায়। মনে হয় এখনও নীল জলরাশি, অপরূপ প্রকৃতি আমায় হাতছানি দিচ্ছে।

লেখক পরিচিতি

প্রাক্তন মহাপরিচালক

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

What Can You Learn From the Hubert H. Humphrey Fellowship?

Al-Beli Afifa

The Hubert H. Humphrey Fellowship is a Fulbright exchange activity and main funding is provided by the U.S. Congress through the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State. I had the opportunity to attend this Fellowship and studying Human Rights at the Humphrey School of Public Affairs in the University of Minnesota. The fellowship program brings professionals from developing countries for schoolwork and practical experiences. Humphrey Fellows are selected based on their talent for leadership and commitment to public service. This Fulbright exchange activity offered me treasured prospects for leadership development and professional engagement with Americans and other participating nations. I attended the program to encourage a long-standing exchange of acquaintance and sharing issues of common concern in the U.S. and my home country Bangladesh.

As my placement in 2016-2017 Humphrey Program, I started my journey in the U.S. with Pre-academic English and Orientation Course at the University of California, Davis, California. This course includes English training, seminar on 'Leadership, Conflict resolution and stress management', visit to the State Capitol, meeting with the Mayor, community interaction, Language practice, celebration of International student's festival, and many more things including site seeing. After this course, I went to the University of Minnesota to study Leadership and Human Rights. I studied academic courses such as Public Safety Leadership, Global Public Policy, Human Rights Policy, and International Human Rights Law. In addition, I attended a writing and research workshop. This workshop focused on both professional correspondence and academic writing. I learnt very different principles and strategies to focus on for a U.S. audience and for academic writing. The workshop emphasized academic writing such as research papers or publications as well as professional writing including emails and letters. How can we sound sophisticated yet being clear and straightforward? How can we make the key points stand out for the US audience? How do I properly document my sources? This very practical workshop addressed these common concerns and taught me specific strategies of writing for classes and professional communications.

The program also offered fellows the "Professional Affiliation" to develop professional experience in their respective fields. This component of the program allowed fellows working with organizations in the United States to gain practical professional experiences. This affiliation was at a higher level of engagement, oriented toward a more in-depth experience that reflected fellows' professional background, skills, and prior experiences. Therefore, I did two Professional Affiliations. The first affiliation was with the Hennepin County "No Wrong Door Initiative" in Minnesota to support the sexually abused youth and to protect their rights. As I got the opportunity to be involved with the initiative, I do salute the steps of the Hennepin County to work for this social issue by involving different parties in their framework such as parents, youth, health sector, detectives, sheriffs and others. I appreciate their plan to establish a law enforcement taskforce to deal with the related cases and victims. From this affiliation, I learnt the proactive policies of policing to protect survivors, prevent trafficking and to prosecute traffickers. This affiliation helped me developing in depth knowledge of youth abuse - causes, consequences and about those who manipulate, use and abuse the youth. I also learnt the issue from law enforcement perspective such as the key stakeholders, survivors and the perpetrators of trafficking which gave me better understanding about the issue. Being a law enforcement officer from Bangladesh, I learnt how the Sheriffs and detectives in the U.S. specifically in Minnesota identify and investigate cases, and prosecute human traffickers. All these equipped me with better understanding of prevention, awareness, service delivery, and investigation. After that, I moved to New York from Minnesota and did my second professional affiliation with the Permanent mission of Bangladesh to the United Nations, New York. There I worked for the UN Fifth Committee related to administration, budget and financing in the Peacekeeping Operations. This affiliation equipped me with learning how to submit a draft resolution; how the committee reach an agreement, and how do they work with the General Assembly of the UN which was very much motivating and thought-provoking for me.

In addition, I pursued a variety of professional activities including site visits, seminars, and workshops. I attended several seminars and workshops including American Management Association(AMA) Seminar on "Dealing with Emotions in the Workplace Conflict" at the AMA center, New York; "The Global Leadership Forum on Gender Equality" in Washington D.C.; "Leadership and Governance during

Times of Crisis Workshop" at the Syracuse University, New York; "Justice Involved Women and Girls at Amherst H. Wilder Foundation, Saint Paul, Minnesota"; "Strip Club Entertainers Harassment" at City Council in Minneapolis, Minnesota; "Understanding Historical Narratives and What That Means to Leaders" at UJAMA Place, Saint Paul, Minnesota etc. I visited the Woodbury Police Station, the Target Center Brooklyn, the Emergency Operations Training Facility at Minneapolis, Ujamaa Place at St Paul, Hennepin County Sheriff Jail and Crime Lab Minnesota, Hennepin County Sheriff Enforcement Division, Hennepin County Government Center, Hennepin County Attorney Office, Minneapolis Police Department, Hennepin County Children Services to know about their wonderful work and sharing my experience. Besides, I attended "Ocean Conference"; Conference on "Negotiation of a Nuclear Weapons Prohibition Treaty"; "Together for Ensuring Sexual and Reproductive Health and Human Rights of Women and Girls with Disabilities: How to tackle multiple discrimination and inequalities" and Ocean Conference side event organized by Swedish Agency for Marine and Water Management on "Can We Achieve SDG 14 Without Looking Upstream?"; and conference by the United Nations Women Entity on "Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)"in the United Nations Headquarters. All these seminars and workshops were the best scopes for me to learn about the common issues throughout the world, hearing about their techniques and best practices to handle, and sharing my insights and thoughts with the international community.

Moreover, I availed some speaking opportunities to share some common issues in the U.S and in Bangladesh as well. I participated in a speaking panel on "Human Rights, Immigration and Refugee Experience" at the University of Minnesota, Duluth, Minnesota. Since Bangladesh is experiencing Rohingya refugees for decades, and I studied human rights, therefore, I was one of the best fit to share my knowledge on Rohingya refugees and their rights. I did some other speaking opportunities such as "Law Enforcement Challenges in Dealing with Human Trafficking Cases" in front of Hennepin County Advisory Board in Minnesota; "A Comparative Study: the U.S. Police and Bangladesh Police"; "Human Trafficking: Role of Bangladesh Police" at Woodbury Police Station, Minnesota and on "Women Participation in Crime specially in Terrorism" at the University of California, Davis, California.

Additionally, I did some volunteer activities such as Volunteering with

the Hennepin County Government Center for the U.S. Election work, volunteering in a shelter home at Simpson House, Minneapolis to serve homeless people for dinner and cleaning up, and volunteering as a table facilitator at Falcon Heights United Church, Saint Paul, Minnesota. These were the opportunities for me to use my skills to help others, expanding my networking, at the same time to learn how the U.S. people making differences by doing something that they enjoy.

Another beautiful component of the program was the host families. Every fellow had one or two host families who supported them in settling down and overcoming the cultural shock once they arrive at the new places. These families opened their doors for the fellows and make them like their own family members. They help the fellows to know about American culture, social norms, celebrate cultural, social and religious activities and others. I celebrated Christmas, Halloween (Trick to treat), Eid, birthday, Mother's Day, and Thanks giving Day with my host families. We alsodid fun activities such as snow sledding, ice skating, attending Arbonne beauty program, watching theatre on "the production of Annie the musical", farmers market visit, apple picking, visiting Children's Museum and state fair, observing Indigenous People's Day celebration program, and many more.

Furthermore, the Fellowship Program was a wonderful opportunity to make new friends. Now I can say, I have friends in forty- seven countries of the world. I had the opportunity to live for a year with fifty-five fellow friends from 47 different countries almost from all corners of the world. This amazing bonding is a lifelong positive feature. Recently, I received a wedding invitation from Hungary. One of our female fellows was from Hungary; her wedding reception will be in July. She invited all of us to attend the ceremony. This invitation again introduces a new conversation among us and made all of us attached one more time. In addition, I met my friends and relatives in the United States, made new friends with American families, communicated International Association of Women Police (IAWP) members and regional coordinators in California and Minnesota. I also established communication with Hennepin County Sheriffs in Minnesota, Minneapolis Police Department, County Administration, and other professionals in the United States. I visited Minnesota Department of Human Rights, Global Minnesota, Human Rights Watch in New York, Global Rights for Women, Program for Aid to Victims of Sexual Assault (PAVSA) in Duluth, Minnesota and some

other Human Rights Organizations for sharing my experience and learning new ideas. I also met Governor in Minnesota, Senators and other local representatives. I met some Bangladeshi families in California, Minnesota and in New York whom I had never met in Bangladesh.

Finally, the Humphrey Program equipped me with international cooperation, capacity building and most importantly, of leadership. It is the endless and enormous dividend the Humphrey Fellowship has kept paying forward. The program has stood the test of time as one of the most impactful examples of networking, leadership, commitment to public service, and for greater understanding among nations which will benefit me as well as my organization in the days ahead.

লেখক পরিচিতি

Additional Superintendent of Police
Bangladesh Police
Hubert H. Humphrey Fellow 2016-2017
University of Minnesota
Cell: +8801731142959 (BD)
Email: albeli.afifa@gmail.com

গৃহকর্মের শ্রমবিভাজন এবং কর্মজীবী নারী

ড. মালেকা বিলকিস

"হে নারী,
এমনভাবে বাঁচো
যেন প্রতিটি দিনই তোমার
যেদিন বাঁচতে শিখবে তেমনি করে
জেনো সেদিন,
প্রয়োজন হবেনা আর
তোমার জন্য আলাদা কোনদিন।"

উল্লিখিত পংক্তি কয়টি বেশ কবছর আগে একটি পত্রিকায় নারী দিবসে একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের পাতায় ছিল যা নারীর বর্তমান অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতবাহী একটি উক্তি। সেই প্রাচীনকাল থেকেই নারীর অবস্থান সমাজে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও বর্তমানে অনেকটাই মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কাঙ্খিত পরিবর্তন কি আদৌ ঘটেছে, সকল ক্ষেত্রে সমতায় কি আসতে পেরেছে নারী? তাছাড়া নির্যাতনের মাত্রাই বা কতটুকু কমেছে! নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা এতটুকু কমেনি বলেই এখন প্রয়োগ করতে হয় 'নারী নির্যাতন দমন আইন', 'যৌতুক বিরোধী আইন' ইত্যাদির। শিক্ষা-দীক্ষায় নারীর অগ্রযাত্রা মাত্রা পেয়েছে সত্য, কিন্তু সে অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি। আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার ৫৩ ভাগ যা পুরুষের চেয়ে এগিয়ে। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এমআইডব্লিউএ এর ২০১৫ সালের তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশে প্রতি ১০০ পুরুষের বিপরীতে নারীর হার ৮৩.৩ ভাগ। শিক্ষানুপাতে নারী পুরুষ কর্ম হার সমান্তরাল হলে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হত নিঃসন্দেহে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে নারী উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান পূর্বশর্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে নারীর অবনমনের প্রধান কারণ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব। তবে নারী কি বেকার? তারা কি কর্মহীন অলস সময় কাটায়? জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিশ্বে নারীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ। মোট শ্রমশক্তির ৪৮% এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। পৃথিবীর মোট কাজের তিনভাগের দুইভাগ করে নারী সম্প্রদায় এবং পুরুষের চেয়ে ১৫ গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে নারী। কিন্তু নারীর গৃহকর্মের কোন অর্থমূল্য না থাকায় প্রতিবছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর অদৃশ্য অবদান হিসেবে ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়।

বর্তমানে শিক্ষিত নারীদের উপর্যুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে। অর্থনীতিতে নারীর অর্থনৈতিক অবদান স্বীকৃতি পেত। কিন্তু এক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতার কারণ হচ্ছে গৃহকর্মের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজন এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা। সমাজে জেন্ডারের সাধারণতঃ ৩ ধরনের ভূমিকা রয়েছে। যেমন (১) পুনঃ

উৎপাদনমূলক কাজ (২) উৎপাদনমূলক কাজ এবং (৩) সামাজিক কাজ।

পূনঃউৎপাদনমূলক কাজ হচ্ছে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, বাড়িঘর পরিস্কার করা, পানিও জ্বালানী সংগ্রহ, গৃহের লোকজনের দেখভাল, সেবাযত্নসহ যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করা। এসব কাজের বিনিময় মূল্য নেই বলে এগুলো স্বীকৃতিহীন।

উৎপাদনমূলক কাজ হচ্ছে যেসব কাজের বিনিময়মূল্য আছে অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে পয়সা পাওয়া যায়। এসব কাজ সাধারনত পুরুষরাই করে থাকে। তবে বর্তমানে নারীরাও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সামাজিক কাজ হচ্ছে যেসব কাজ কোন অর্থমূল্য ছাড়াই সেবামূলক কাজ হিসেবে এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অংশগ্রহন করে করা হয়। এটা নারী পুরুষ উভয়েই করে থাকে। অথচ এই তিন ধরনের কাজের মধ্যে পুরুষদের কাজ হচ্ছে মূলতঃ একটি উৎপাদনমূলক কাজ। তবে সামাজিক কাজটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পুরুষরা করে থাকে। নারীদের মূল কাজ পূনঃ উৎপাদনমূলক কাজ এবং ঐচ্ছিক কাজ হিসেবে সামাজিক কাজও করে থাকে। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে যেসব নারী কর্মসংস্থানে ঢুকেছেন তাদের কাজ কিন্তু তিনটিই। এজন্য কর্মজীবী নারীর ভূমিকাকে দ্বৈত ভূমিকা বলা হয়। তবে অনেক নারীই পুরুষের মত সরাসরি উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহন করতে পারে না তাদের পূনঃ উৎপাদনমূলক কাজের জন্য। বর্তমানে সমাজে যেসব নারী অক্টোপাসের বাঁধন ছিঁড়ে শত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তারা অনেকটাই স্বাধীন। তবে এই স্বাধীনতার জন্য প্রতি পদে পদে নারীকে দিতে হচ্ছে চড়া মূল্য। যেমন একজন পুরুষ বাইরের কাজ সেরে গৃহে স্বাধীন এবং আয়েশপূর্ণ জীবনযাপন করে যা নারী পারেনা। নারী অফিসের কাজ সেরে বাসায় ঢুকেই তাঁর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সন্তানের পড়াশোনা দেখানো, স্বামী-সন্তান, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী থাকলে তাঁদের দেখাশুনা, খাবার-দাবার তৈরী করা সবই নারীর কাঁধে। নারী কোন অবকাশ বা চিত্তবিনোদনের সুযোগ পায়না। এমনকি নিজের শরীর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখার মত অবকাশ তারা পায়না। এজন্যই বলা হয় কর্মজীবী নারী পুরুষের ১৫ গুণ বেশী কাজ করে। কিন্তু সহমর্মিতার দৃষ্টিতে অনুধাবন করলে দেখা যায় একজন পুরুষ শুধু সন্তান জন্মদান ছাড়া বাকী সব কাজই করতে পারে। এতে করে নারীরা গৃহকর্মের বাইরে বৃহত্তর গন্ডিতে গিয়ে আয়-উপার্জনমূলক কাজে অংশ নিতে পারবে। নিজের অবকাশ এবং বিনোদনের সুযোগও পাবে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, জেন্ডার শ্রমবিভাগ তথা গৃহকর্মের শ্রমবিভাজনই নারীর অধঃস্তনতার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিধান নয়। এটি মনুষ্য সৃষ্ট।

প্রাগৈতিহাসিক সমাজে কিন্তু নারীর হাতেই ছিল নেতৃত্বের দন্ড। প্রথমে শিকারজীবী, তারপর কৃষিজীবী, পণ্যজীবী এভাবে নারীর অবস্থান পরিবর্তন হতে থাকে। কারণ সন্তান ধারণ এবং প্রসবকে নারীর উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতা

মনে করার পর থেকেই নারী গৃহকর্মে বন্দী হতে থাকে। কখনো কখনো নারী শিশুর সংখ্যা কমানোর জন্য পুরুষ কর্তৃক তাদের হত্যাও করা হত। সে সময় থেকেই হয়তো পুরুষ কর্তৃত্বে চলে যায় আর নারী হয় অবদমিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উল্লিখিত ৩ ধরনের কাজের মধ্যে সন্তান ধারণ এবং প্রসব সময় বাদে প্রতিটি সময় নারী কর্ম উপযোগী। কিন্তু যুগে যুগে নারীকে গৃহে অন্তরীন করা হয়েছে সামাজিক দায়-দায়িত্ব যেমন- দাদা-দাদী, নানা-নানী,, বাবা-মা, শ্বশুড়-শাশুড়ী, স্বামী-দেবর-ননদ, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে। অথচ এই দায়িত্বগুলো পুরুষ সম্প্রদায়ও নির্দ্বিধায় পালন করতে পারে। কিন্তু জন্মের পর থেকেই পুরুষের সামাজিক ট্র্যাডিশান এভাবে তৈরী হয়ে গেছে যে, গৃহকর্মকে তারা অপমানজনক হিসেবে দেখে। তাছাড়া নারীর গৃহকর্মকে তারা অবমূল্যায়নও করে থাকে। কারণ এতে সরাসরি মজুরী পাওয়া যায় না। যদি গৃহকর্মে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হতো, তাহলে দেখানো যেত নারীর কর্মসংস্থানের পরিমান শতভাগ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখেছেন **"মেয়েদের কলে-কারখানায় টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু তার সন্তানদের কে দেখবে এবং তার স্বাস্থ্য ও বিশ্রামের সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্র।"**

কিন্তু নারী যদি উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা গৃহকর্মে শ্রম না দিয়ে বাইরে কোন উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে অর্থনৈতিকভাবে নারীর মূল্যায়ন ও হবে এবং পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নও ঘটবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যহিক গৃহকর্মের ক্ষেত্রটি থাকবে উপেক্ষিত। কিন্তু গৃহকর্মের ক্ষেত্রে প্রচলিত যে, শ্রমবিভাজন রয়েছে, যেমন- রান্না-বান্না, সংসার সামলানো, সন্তানদের দেখাশুনা, আতিথেয়তা করা ইত্যাদি নারীদের কাজ আর পুরুষদের কাজ হচ্ছে বাইরে শ্রম দিয়ে উপার্জন করা, বাজার করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শ্রমবিভাজন না করে সাংসারিক কাজ কর্মে পুরুষরা সহায়তা দিলে নারী গৃহের বাইরে উপার্জনমূলক কাজ করতে পারবে। গৃহকর্মের শ্রমবিভাজন রোধে নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে ধীরে ধীরে। কারণ এ পরিবর্তন একদিনে বা এক যুগে আসবেনা। একদিনে পরিবর্তন চাইলে তা পুরুষের অহংবোধে আঘাত করবে এবং মর্যাদা হানিকর হিসেবে তা দেখবে। ক্রমে ক্রমে নারী এই পরিবর্তন তার সন্তানদের মধ্যেই শুরু করলে একসময় তা বিস্তৃত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থানে পৌছে যাবে। তাই নারীর সমতায়ন চাইলে প্রথমেই গৃহকর্মের শ্রমবিভাজন রোধে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে, নিজের পথ নিজেকেই তৈরী করতে হবে। ১৯৪৯ সালে লুইস অটো পিটার্স বলেছিলেন, **"সর্বকালের এবং বিশেষ করে আজকের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে, নারী যদি নিজেদের কথা ভাবতে ভুলে যায়, তাহলে তাদের কেউ মনে রাখবেনা।"**

লেখক পরিচিতি
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

বিশ্ব নারী দিবস ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নারী ভাবনা

মালেকা আক্তার চৌধুরী

আজ আমার বড় মায়ের কথা ভাবতে বড়ো ভালো লাগছে। সত্তর দশকের শেষ দিকের কথা, আমি কেবল ছোট্টটি। মহান মুক্তিযুদ্ধের বছর ১৯৭১। আমার বাবা সেই ঐতিহাসিক বছরটিতেই সরকারী চাকুরী হইতে অবসরে যান। আমি স্কুলেও ভর্তি হইনি। কিন্তু যার কথা বলার জন্য এসব বিষয়ের অবতারণা করছি তিনি সম্ভবত চল্লিশ এর দশকের গোড়ার দিকে সে সময়কার রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রথা-রীতিকে ভেঙে দিয়ে কণ্ঠে তুলেছিলেন সুরের মূর্ছনা। যে সুরের মূর্ছনায় আমার বাবা একজন গোল্ড মেডেলিস্ট হয়েও তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। বাপের বেটা বটে। তিনি আমার বড় মা। পরম মমতায় ভালোবেসে আমার নাম রেখেছিলেন মালেকা। মালিক থেকে মালকা, মালেকা এসব ভেবে নাকি তিনি আমার জন্য এই নামটিই ঠিক করেছিলেন। আমার আম্মার মুখে শোনা, মুর্শিদাবাদ আর পাবনার কন্যা আমার সেই বড় মায়ের নাম ছিল "সায়েরা"- এর বেশী কিছু আমার জানা নেই। আমার আম্মাও আজ শয্যাশায়ী, বোধ-বিবেচনাহীন। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে আমার সেই শিশু বা বাল্যকালের তেমন স্মৃতি খুব একটা মনে করতে না পারলেও বেড়ে উঠতে উঠতে দেখেছি তাঁর সুনিপুণ হাতে বোনা সূচ-শিল্পের অপূর্ব কারুকাজের কাচের ফ্রেমবন্দী দুটি বাধাঁনো শিল্পকর্ম যাতে তাঁর প্রগতিমনের নি:শব্দ প্রকাশ ও বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কবি নজরুল ইসলামের অবিস্মরনীয় সেই নারীকে নিয়ে লেখা কবিতার ক'টি লাইনঃ

জগতের যত বড় বড় জয়
বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে
হইয়াছে মহীয়ান।

অন্যটি হলোঃ

দিবসে দিয়েছে শক্তি সাহস,
নিশীথে হয়েছে বধূ
পুরুষ এসেছে মরু তৃষালয়ে,
নারী জোগায়েছে মধু।

সেই শিল্পকর্ম বুঝতে না বুঝে উঠতেই কোথায় কীভাবে হারিয়ে গেল আজ আর তার অবশিষ্টাংশও নেই। আজ এতো বছর পর বড়-মাকে এভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নারী দিবসের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কলেজের বাসে করে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছি, হঠাৎই "মালেকা আপা" ডাক শুনেই উন্মুখ হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছোট বোন সালমা বেগম। সালমা ঝটপট বলে ফেললো, আপা নারী দিবসের উপর লেখা দিতে হবে। আমার প্রতি এ মেয়েটির আস্থা ও ভালোবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হই। ইতঃস্তত করে সময়টা জেনে নিলাম বটে, তবে এতো অল্প সময়ে পারবো না বলেও জানিয়েছিলাম। যা হোক মনের আনন্দেই লেখাটা শুরু করেছিলাম।

আজ ৮ মার্চ, বিশ্ব-নারীদিবস হিসেবে এ দিনটিকে চিত্রায়ন করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, এ বিশ্বে কোথাও "পুরুষ দিবস" বলে কোনো বিষয় আছে কী? নেই যদি তাহলে প্রথম বৈষম্য এখান থেকেই শুরু হয়েছিলো। বিশ্ব নারী দিবস পালনের পিছনে রয়েছে অসাধারণ এক অধিকার আদায়ের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে। একটি সূচ কারখানার মহিলা শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে মজুরী বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্টকরণসহ মানবেতর জীবনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। সেই আন্দোলনে চলেছিলো সরকারের দমন-পীড়ন নীতি। ফলশ্রুতিতে ১৯১০ সালের ৮ মার্চ কোপেনহেগেন শহরে অনুষ্ঠিত এক আর্ন্তজাতিক নারী সম্মেলনে জার্মানির মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ এ দিবসটিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর বাংলাদেশে ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

এদেশের নারী সমাজ যুগ যুগ ধরে যেমন শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত থেকেছে তেমনি আবার যুগ-পরিক্রমায় কখনো-সখনো এর ব্যত্যয়ও ঘটেছে। সমাজ বাস্তবতায় নিষ্প্রভ নারীকুলে আর্বিভূত হয়েছেন প্রগতিশীল মহীয়সী অনেক নারী। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিগড়ে আটকা পড়ে যথাসময়ে যথাস্থানে তাঁকে বাড়তে দেয়া হয়নি। নারী নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, ধর্মীয় গোড়ামীর যূপকাষ্ঠে আস্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। সামাজিক সংস্কার, কূপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে অবদমন করে রাখা হয়েছে। এ চিত্র অল্প-বিস্তর সারা বিশ্বজুড়েই। নারী যেনো নৈঃশব্দ্যের এক অনবদ্য আলেখ্য। নিজস্ব কোনো অভিমত থাকতে নেই, ভালো-মন্দ বিচার করার শক্তি নেই, সূর্য কিরণেও তার ছায়া পড়তে নেই। নারীর প্রতিভাবান মেধা আর শ্রমশক্তিকে চার দেয়ালে ঘেরা সংসার নামক যন্ত্রেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিলো। সমাজ, দেশ এবং জাতি গঠনে নারীকে কখনোই সম্পৃক্ত করা হয়নি।

কিন্তু উনিশ শতকের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে রেনেঁসার মানব কল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় হলো নারী জাগরণ। নারীরা নিজেরা এতোই অসহায়, দুর্বল, অধিকারহীন ও অক্ষম ছিলো যে নিপীড়িত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা তারা ভাবতে পারেনি। সমাজের সার্বিক প্রগতির প্রেক্ষাপটে যারা এগিয়ে এসে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চা শুরু করেন তারাই রেনেঁসার মানবিক দিক বিবেচনায় নারী সমাজের প্রতি নির্যাতন রোধে

আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং নারী-নিপীড়ন বন্ধের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরীর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) প্রমুখ। (মালেকা বেগম, বাংলার নারী আন্দোলন, পৃঃ ১৫, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)।

নারী আন্দোলনের অগ্রদূত চির চেনা সেই মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) নারী জাগরণের আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তাহারা নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক" উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিলো সাধারণত শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। বিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিলো সেখানে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক শ্রেণি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। স্বদেশী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন এবং টংক ও কৃষক আন্দোলনসহ অন্যান্য আন্দোলনে এদেশের নারী সমাজ চিরাচরিত ঐতিহ্য ও গন্ডির বাইরে এসে বিপ্লবী যোদ্ধার দায়িত্ব পালন করেছে। তাঁদের মধ্যে যাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে তারা হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, হাজংমাতা রাসমনি ও ইলা মিত্র। (সুফিয়া বেগম, বিপ্লবী ৩ নারী, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা)। এছাড়াও ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে। যার প্রধান লক্ষ্য ছিলো যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে তা কার্যকর হয় নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড বলে বিবেচিত (জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)।

এতো নারী ভাবনা, এতো ক্রম-পরিবর্তন, নারী ভাগ্য বদলের এতো আয়োজন তবুও থেমে নেই নারীর প্রতি সহিংসতা, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, অপমৃত্যুর ঘৃণ্য ফাঁদ। রয়েছে আত্মহননের মতো ভয়ংকর বীভৎস্য নিষ্ঠুরতা। কেন এই আত্মহনন? নারী কি কখনোই নিজেকে পরিপূর্ণ ভাববে না? কোথায় তার প্রতিবন্ধকতা? শাশ্বত এই নারী চরিত্র বড়ো অদ্ভুত, কখনও কখনও চকচকে মখমলে

মোড়ানো জীবনের মোড়ক থেকে সে বাইরে এসে হাফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। সময়ের জলতরঙ্গে সে ভেসে বেড়ায় আপন ভুবন রচনা করে। কিন্তু নারীর সাহসিকতাকে নিরাপত্তার মোড়কে মুড়িয়ে দেয়া হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেকেলে অবরুদ্ধ মানসিকতা। ধর্মীয় রাজনীতির অপব্যবহার নারীকে আরো বেশি কোণঠাসা করে তোলে, করে তোলে অন্তঃপুরবাসিনী। ঘর-কন্যা, সংসার-স্বামী, সনাতন সব আচার-নিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা সমাসীন, তাহলেই সে মহীয়সী। অথচ এ সমাজ-সংসারে নারী পুরুষের গুরুত্ব ও মর্যাদা হওয়া উচিত সমানে সমান। নারী আজ কোথায় নেই? আকাশে-বাতাসে, হিমালয়ে-সাগরে-অন্তরীক্ষে, ক্ষমতায়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তারপরও নারীর সীমাহীন বেদনার্ত-বিষণ্ন প্রহর। রয়েছে প্রতীক্ষার মায়াময় প্রহরও, স্মৃতির শিহরণ জাগানিয়া বিমূর্ত-মুহূর্ত, আছে কল্পনায় স্বপ্নগুলোর রঙিন ডানা মেলার উচ্ছ্বসিত আয়োজন। তবুও নারী তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একাকী, প্রার্থিত-প্রতিক্ষীত প্রহরগুলোতে সে তার কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে পাশে পেতে চায়। কিন্তু না, সে কী তার আহলাদী মনের স্বপ্নডানায় ভর করে উড়ে যেতে পারে? প্রত্যাখানের আগুনে পুড়তে থাকা মানবীয় সে নারী আত্মগ্লানি আর দুঃখের ক্লেদাক্ত শিহরণে বার বার জর্জরিত হতে থাকে। সময়ের শরীরে আরো পুরু হয় এসব দুঃখের আস্তরণ। নিরুত্তাপ বিকেলের সন্ধ্যে ছায়ার হাতছানি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাতের বিষণ্ন সিড়ি বেয়ে তার সময় ঝাঁপ দেয় অগভীর জলের বর্ণিল কারুকাজে। আর তখনই সে পরিচিত হয় নষ্টা-ভ্রষ্টা, চরিত্রহীনারূপে। কেন এমন সহজ চরিত্রহনন? আবহমানকালের ইতিহাস যে কথা বলে সে চিত্রও ভিন্ন ! পরিবেশ-প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যে নারী তিলোত্তমা, সে-ই আবার ভিন্ন বাতাবরণে চরম নিগৃহীত-নিপীড়িত। মুঘল সাম্রাজ্য কিংবা অটোম্যান সাম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই সে-টি বহুগুণে-বহুমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠে। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় আঙ্গিক-অবস্থান আর্ন্তজাগতিক জটিলতা বিন্যাস ও কৌশলে সার্বিক নারীসত্তাকে নিংড়ে নিংড়ে শুধু পোস্টমর্টেমই করা হয়, কিন্তু জটিল প্রথাসিদ্ধ পুরুষতান্ত্রিক সমাজবাস্তবতায় নারী-চেতনার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে অসার-ঠুনকো-অপসৃয়মান বলেই প্রতিবিম্বিত করা হচ্ছে। পদে পদে নারীকে করা হয়েছে শৃঙ্খলিত, সতীত্বের বেড়াজালে জড়িয়ে উর্ত্তীণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। সামাজিক এহেন অবক্ষয় ও নারী মানবতার সূক্ষ্ম বিষয়টি প্রকৃত মানব অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যুগ যুগ ধরে অবহেলিতই রয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত এবং কিংবদন্তীতুল্য কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের যাপিত জীবনে বহুমাত্রিক অনুষঙ্গে অঙ্কিত নারী জীবনের নানা জীবন ঘনিষ্ঠ চালচিত্র উঠে এসেছে।

তাঁর "সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য" গল্প গ্রন্থে যে দশটি গল্প স্থান পেয়েছে সে সব গল্পের নারী চরিত্রগুলোতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির আলোকে সমাজ জীবনের নানামুখী ভোগবাদী অবক্ষয়, শোষিত-ক্লিষ্ট নারীদের হাহাকার বঞ্চনার এবং কখনো কখনো তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবি। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে হাসান আজিজুল হকের গল্প মোটামুটিভাবে যৌন সর্বস্বতাবাদকে আশ্রয় করে

গড়ে উঠলেও প্রাকারান্তরে এর মধ্য দিয়ে- "ব্যক্তির যৌন জীবনের পদস্খলন যা আমাদের সমাজের মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে পাপাচরণের নামান্তর মাত্র - হাসান তাঁর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রাণকেন্দ্রে উপস্থিত হবার চেষ্টা করেছেন" (জাফর, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা ২৯)। একই সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলোর বিচিত্র পটভূমিতে বিরূপ সময় ও সমাজবন্দী নর-নারীর আর্ন্তজাগতিক জটিলতা এবং তার অবচেতনার বহুভূজ রহস্যময় প্রবৃত্তির নানামাত্রিক চিত্রায়ন লক্ষ্যণীয়। সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা নারী-পুরুষের অসম সামাজিক পটভূমি, সম্পর্কের বহুতলিক বিন্যাস, নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এসবের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নারীর গুহায়িত জীবন রহস্যের আলোকপাতপূর্বক তখনকার সময়-পরিবেশ, ব্যক্তি-সমাজের জটিল-মিশ্র জীবন অভিধানের বহুমাত্রিক স্বরুপটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজসত্যের পটভূমিতে। (হাসান আজিজুল হক, নারী জীবনের রুপায়ণ, সাহিত্য পত্রিকা।। বর্ষ ৫৩।। সংখ্যা: ১।। অক্টোবর ২০১৫)

সময় বাস্তবতার নিরিখে নারী শুধু নারী হিসেবেই চিত্রিত, স্তব্ধ সময়ের উত্তাপহীন পদচারণা। কোন ইচ্ছে- অনিচ্ছে থাকতে নেই যেনো। এ সমাজ সংসারের নিরিবচ্ছিন্ন গতিধারা থেকে ছিটকে পড়া মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও এর অন্তরালে সমকালের সর্বনাশের অসহনীয়, বীতশ্রদ্ধ নারী-পুরুষের চিরায়ত স্বাভাবিক সম্পর্ককে গোপনীয়তার অনুশাসনটি নারীর ক্ষেত্রেই কেবল জোরালোভাবে বলবৎ রাখা হয়েছে। নারীকে এরুপ সম্পর্কের বেড়াজালে কেবলই একাকী দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রাকারান্তরে সমাজ, পরিবার নারীর প্রতি উপেক্ষা-উপায়হীনতা এবং প্রথা-প্রসূত ভাবনায় তার সমস্ত অস্তিত্বকে-চিত্তকে সংকটাপন্ন করে তোলে। পুরুষ মানুষটির বেলায় কিন্তু বিষয়গুলি একইরকম সংকুচিত নয়। সময়ের সমান্তরালে নারী চরিত্র কখনো কখনো পুরুষতান্ত্রিকতার অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্রতীপ অবস্থানে দাড়িঁয়েছে। তবে সে অবস্থান সরবে নয়-নীরবে, সহাস্যে নয় ঘৃণাভরে। আজও সে বোবা জানোয়ারের মতো অবলা। ধর্ষিতার আত্মচিৎকারে ছিন্নভিন্ন হয় খবরের কাগজ, আত্মহত্যার রশিতে বিনুনি গেথেঁ মনের সুখে জাবর কাটে হন্তারক। এছাড়াও নারী বিষয়ক বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা থেকেও নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে করেও গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাড়িত হতে হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১৭ সালে ২৫১ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। ডিজিটালাইজড বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির অপব্যবহারেও স্কুল-কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক-মানসিক-সামাজিকভাবে নিদারুণ পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, কন্যা শিশুদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। সাম্প্রতিককালে রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামীদের ফাঁসির আদেশ দেওয়ায় বিচারিক আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস উভয়ই বেড়ে গিয়েছে। নারীর প্রতি যে কোনো ধরনের সহিংসতায় এ ধরনের তাৎক্ষনিক শাস্তি-প্রদান সমাজের জন্য হবে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন।

আমাদের গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও এ ধরনের অপরাধের প্রতি জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করছে। এ ধারাকে আরো গতিশীল ও বেগবান করা জরুরী। তবেই এ ব্যাধিগ্রস্ত ঘুণে ধরা সমাজজীবনে সুস্থতার-মানবিকতার সুবাতাস বইবে। ফুলগুলো হেসে উঠবে একসাথে। ওদের ঝরতে দেবো না আমরা।

তবে নারীর কোমলতা-কমনীয়তাকেও সযত্নে লালন করতে হবে, সেও সমাজ-সংসারের অনিবার্য প্রয়োজনে। নারী অন্ততঃ এক জায়গায় সে পরম শাশ্বত। অসহায় সে নয়-এ অসহায়ত্ব স্বেচ্ছাকৃত। আবেগ জড়ানো ভালোবাসায় নিজেকে উজাড় করার একান্ত মিনতি। ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার এই কাঙালিপনা। এক্ষেত্রে নারী বাতাসের চেয়েও হালকা, তুলোর চেয়েও কোমল। স্বতঃস্ফূর্ত এ ভালোবাসাকে অস্বীকার বা অমর্যাদা করার অধিকার কারো নেই। প্রখ্যাত আরেক জন কথা সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের অসাধারণ সৃষ্টি "নিষিদ্ধ রমণী"র মিমোসা আক্তার। বিদ্যমান সমাজে উঁচুতলার উঁচু মাপের মাঝবয়োসত্তর একজন সেলিব্রেটি লেখিকা। যাকে এরকম অসম-সম্পর্কের পরিণতিস্বরূপ আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। যেটি সচেতন পাঠককুলকে ব্যথিত করেছে। মিমোসার এভাবে চিরতরে চলে যাওয়া পাঠক সমাজ মেনে নিতে পারেনি। মিমোসাদের কোনো অনুভূতি-অনুযোগ, ভালোলাগা-ভালোবাসা থাকতে নেই। স্বাভাবিক জীবনযাপনে তাদের সমাজ-স্বীকৃত কোনো অধিকারও নেই। তদুপরিও মিমোসার আত্মহনন পরোক্ষভাবে হলেও পারিবারিক স্বীকৃতি এবং মর্যাদা আদায়ের পথটিকে প্রশস্তই করেছে।

না, কোন প্রতিহিংসার দহন নয়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অপার এবং অনুপম রহস্যে ভরপুর দুজন মানব-মানবী এ সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য হিরণ্ময় অংশ। সমাজ সংসারে কেউ কারো চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অবজ্ঞা, অবহেলা-অবিশ্বাসের মেকী মুখোশ নয়, প্রাণহীন নিঃশ্বাসের সাথে শব্দহীন বোঝাপড়াও নয়, পারস্পারিক সমঝোতা, পারস্পরিক সহমর্মিতায় নারী-পুরুষ কাধেঁ কাধঁ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে উন্নয়নের মহাবিশ্বে। চিরায়ত বাঙালি নারীর যে চিত্র সমাজে আকাঁ রয়েছে তা অকপটে মুছে দিয়ে নারীর জীবন ক্যানভাস ধূসর বর্ণহীন পলেস্তরা হয়ে নয় চকচকে রঙিন বর্ণিল স্বপ্ন নিয়েই নারী-পুরুষের কর্মপ্রবাহ, যাপিত জীবন হোক আরো সুন্দর আরো মধুময়। সংসার হোক ভালোবাসার স্বর্গীয় এক অমিয়ধারা। নারীর সাথে বসবাস হোক মননে-স্বননে, মর্যাদায়-ভালোবাসায়। সফল হোক বিশ্ব নারী দিবস ২০১৮ঃ

জাগো নারী জাগো
চেতনার প্রদীপ্ত শিখরে
বলিষ্ঠ উন্নত শিরে,
তোমার স্বপ্ন-ছবি আকোঁ।

লেখক পরিচিতি
সহযোগী অধ্যাপক (দর্শন)
সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশের নারী পুলিশ

শামীমা বেগম পিপিএম

বাংলাদেশের নারীরা তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে এবং সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারী বেসরকারী সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ, অবদান আজ দৃশ্যমান স্বীকৃত বাস্তবতা। বর্তমান সরকারের রূপকল্প Vision 2020 এবং 2041 এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের কাংঙ্খিত যাত্রায় সকল নারীরা আজ সহযোদ্ধা ও সহযাত্রী। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুলিশেও নারীর অংশগ্রহণ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুগান্তকারী উদ্যোগে ১৪ নারী পুলিশ সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশ সদস্যদের পদযাত্রা শুরু হয়। সময়ের পরিক্রমায় পুলিশে নারীর অংশগ্রহণের হার বেড়ে এখন ১১৭৬৭ জন দাড়িয়েছে যা মোট পুলিশ সদস্যের ৬.৬৬%। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন যার ধারাবাহিকতায় আজকের এই প্রাপ্তি। বাংলাদেশ নারী পুলিশের সফল পদচারণা আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। জেলার পুলিশ সুপার, থানার ওসি ও সার্জেন্ট পদে সফলতার সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করছে নারী পুলিশ। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (FPU/UNPOL/UNJOB) এ পর্যন্ত ১১০৮ জন নারী পুলিশ সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক অর্জন করেছে। উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার সমূহে অংশগ্রহণ করে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সফলতার স্বাক্ষর রাখছে বাংলাদেশ নারী পুলিশ।

পুলিশ নারীর শক্তি ও সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে কর্মক্ষেত্রে সফলতার ভিত রচনায় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরীর লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২১ নভেম্বর পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রামের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)। দক্ষিণ এশিয়াতে নারী পুলিশের সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশে বিপিডব্লিউএন সর্বপ্রথম এর কার্যক্রম শুরু করে। পুলিশের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে, এ লক্ষ্যে সংগঠনটি নিরন্তর কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশ পুলিশের সকল স্তরে কর্মরত বিভিন্ন পদবীর নারী পুলিশ এ নেটওয়ার্কের সদস্য। নারী বান্ধব এই সংগঠনটি নারী পুলিশ সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করাসহ কর্মদক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণের সু-ব্যবস্থা করা, পেশাদারিত্ব সম্পর্কে দায়িত্বশীল করা, সাহসিকতাপূর্ণ কর্মে উৎসাহ প্রদানসহ স্বাস্থ্য ও

নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালা পরিচালনা করছে। পেশাদারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতায় স্ব-প্রণোদিত হয়ে শিক্ষার্থীসহ সমাজের অন্যান্য অংশীজনের মাঝে নারী ও শিশু নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা, মাদকের প্রসার, যৌতুক ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কমিউনিটি পুলিশের সাথে একাত্ম হয়ে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই প্লাটফরমটি সামাজিক কার্যক্রমের প্রসার ঘটাচ্ছে। বর্তমানে মিলি বিশ্বাস, পিপিএম, ডিআইজি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ও সভাপতি, বিপিডব্লিউএন এর নেতৃত্বে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে নেটওয়ার্কটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের মাননীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

বিপিডব্লিউএন এর সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও অর্জন :

- বিপিডব্লিউএন-এর গঠনতন্ত্র সংশোধনপূর্বক ২০১৪ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি
- নারী পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যদের অংশগ্রহণে বিপিডব্লিউএন-এর ১ম, ২য় জাতীয় সম্মেলনের সফল আয়োজন
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় শহরে বিপিডব্লিউএন আঞ্চলিক কমিটির সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন
- প্রতি বছর পিটিসি রংপুরে ট্রেইনি রিক্রুট নারী কনস্টেবলদেরকে পুলিশি কাজের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত ব্রিফিং
- বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম আয়োজন
- চাঁদপুর ও নরসিংদী জেলায় ২০১৫ সালে জেন্ডার সচেতনতামূলক "Community Awareness Programme" আয়োজন
- স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ) ও মহান বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) এ রাজারবাগ স্মৃতিসৌধে এবং জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট) এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ
- মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
- Law Enforcement and HIV Network (LEAHN) এর সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ ও নারী পুলিশের কল্যাণে স্বাস্থ্য-সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা, ২০১৫ এর আয়োজন
- প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন

- গত ২০১৬ সাল হতে বাংলাদেশ পুলিশ প্রবর্তিত "Bangladesh Women Police Award" আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান
- নারী পুলিশের কর্মদক্ষতা, পেশাদারিত্ব, কমিউনিটি পুলিশিং, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি বছর ঢাকাস্থ এবং রেঞ্জাধীন বিভিন্ন ইউনিটের নারী পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন
- মুন্সীগঞ্জ জেলায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, মানিকগঞ্জ জেলায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক সভায় কমিউনিটির সাথে মত বিনিময়, দুস্থ মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ ও রংপুরে তিস্তার চর এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) এ চিকিৎসারত নির্যাতনের শিকার শিশু ও নারীদেরকে আইনী সহযোগিতার আশ্বাসসহ আর্থিক অনুদান প্রদান
- বিপিডব্লিউএন তথ্য সম্বলিত ব্রোশিওর (২০১৪), কানুন কনিকা-১ (২০১৫), কানুন কনিকা-২ (২০১৬), জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ম্যাগাজিন ও নারী পুলিশের তথ্য সম্বলিত ইংরেজি বুকলেট প্রকাশ
- প্রত্যেক ইউনিটে নারী পুলিশের ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে সমস্যা শোনা এবং সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া
- বিপিডব্লিউএন এর ওয়েবসাইট (www.bpwn.org.bd), ও ফেসবুক পেইজ (Bangladesh Women Police Network-BPWN) এর উদ্বোধন এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে নারী পুলিশের উন্নয়ন, নেতৃত্ব ও সফলতার চিত্র সমূহ উপস্থাপন
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নারী পুলিশের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা
- জঙ্গী দমনে নারীর ভূমিকা বিষয়ক UN Women, BRAC সমন্বয়ে কর্মশালার আয়োজন

BPWN এবং IAWP (International Association of Women Police)

- IAWP (International Association of Women Police) ১০৩ বছরের পুরানো ঐতিহ্যবাহী একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারী পুলিশগণ এর সদস্য
- বর্তমানে বিপিডব্লিউএন এর সভাপতি মিলি বিশ্বাস, পিপিএম, ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ IAWP Region-22 এর Co-ordinator ও সহ-সভাপতি শামীমা বেগম পিপিএম এআইজি ট্রেনিং-২ Co Co-ordinator হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন

- IAWP কর্তৃক আয়োজিত নারী পুলিশের বার্ষিক কনফারেন্সে প্রতি বছর বাংলাদেশ নারী পুলিশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন
- IAWP এবং Region-22 সমন্বয়ে এর অন্তর্ভূক্ত দেশ হতে আগত পুলিশ অফিসারদের সাথে মতবিনিময় ও IAWP এর Membership বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন
- বিপিডব্লিউএন গত ২০১৫ সালে International Association of Women Police (IAWP) এর ৫৩ তম বার্ষিক প্রশিক্ষণ সম্মেলনে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির এফিলিয়েশন লাভ করে

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে নারী পুলিশের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার অংশগ্রহণ
- আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশ পুলিশের আরও বেশি সংখ্যক নারী কর্মকর্তার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ট্রেনিং, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ নিয়ে দেশের সগৌরব প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা ও নেতৃত্ব দানে সক্ষমতা অর্জন করা
- বিভিন্ন কর্পোরেট, সামাজিক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরীর মাধ্যমে সমাজ সেবায় অবদান রাখা
- নারী বান্ধব সংগঠন ICITAP US Embassy, UN Women এর সাথে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের নারী বিষয়ক কর্ম প্রসারতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে

বাংলাদেশ নারী পুলিশগণ তাদের সাহসিকতায়, সংকল্পে সর্বোচ্চ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে নির্ভীক পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ।

এগিয়ে যাবে এ প্রত্যয়
সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান
সংকটের কল্পনাতে ও হয়ো না ম্রিয়মান।
মুক্ত করো ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধর
নিজেরে করো জয়।

ফটোগ্যালারী

Parade of Nations
IAWP 2017 G BPWN

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৮ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এসপি ও তদুর্দ্ধ নারী পুলিশ।

মানবতার সেবায় বিপিডব্লিউএন

ইউএন শান্তিরক্ষা মিশনে মেডেল প্যারেডে নারী পুলিশ

লেখক পরিচিতি
এআইজি (ট্রেনিং-২),বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ও
সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)
মোবাঃ ০১৭৬৯-৬৯৩৫২২

ভায়া (VIA) ও সিবিই (CBE)
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ডাঃ ইসমত আরা লাইজু

বাংলাদেশে মহিলাদের যত ধরনের ক্যান্সার হয়, তারমধ্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার অন্যতম। সারা বিশ্বে যত ধরনের ক্যান্সার বিদ্যমান, তার ভিতর জরায়ু-মুখ ক্যান্সার ২য় স্থানে। জরায়ু-মুখ ক্যান্সার ৮০% এ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হয়ে থাকে। মহিলাদের ক্যান্সার জনিত মৃত্যুর মধ্যে ২০% মৃত্যু হয় স্তন ক্যান্সার এর কারণে এবং বলা হয়ে থাকে যে, এটি হচ্ছে মহিলাদের প্রাচীনতম ক্যান্সার। উন্নত দেশগুলোতে মহিলাদের মধ্যে এটি প্রধান ক্যান্সার। পারিবারিক ইতিহাস ব্যতীত, ২৫ বছর পূর্বে স্তন ক্যান্সার খুব কমই হয়। এরপরেও এটা যেকোনো বয়সে হতে পারে। তবে সব থেকে বেশি স্তন ক্যান্সার হয় মেনোপজের সময় ও পরে।

২০১২ সালে আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা (IARC-WHO) সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ প্রতিবছর নতুনভাবে জরায়ু - মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় ১২০০ জন মহিলা এবং মৃত্যু বরণ করেছে প্রায় ৭০০ জন মহিলা। আমাদের দেশে মহিলাদের যত ধরনের ক্যান্সার হয় তারমধ্যে অর্ধেক ক্যান্সারই হল জরায়ু-মুখ ক্যান্সার। তাই এই দুইটি ক্যান্সার প্রতিরোধ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে বড় ধরনের কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের মৃত্যু ও অসুস্থতার হার এখন পর্যন্ত বেশি। মহিলাদের এই অপ্রত্যাশিত উচ্চ মৃত্যুহারের এবং ভোগান্তির সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ জড়িত এবং সেটি হচ্ছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্ত করে তা প্রতিরোধ এর জন্য এবং সু পরিকল্পিত পদ্ধতি সঠিকভাবে গড়ে না উঠা।

কিছু জনগনের মাঝে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই মনে করে, "আমিতো সুস্থ্য আছি, আমি কেন ডাক্তারের কাছে যাব!" সীমিত সম্পদের দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে।

নিয়মিত জরায়ু -মুখ পরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই ক্যান্সার মুক্ত হয়েছে। জরায়ু- মুখ ক্যান্সার এমন এক ধরনের ক্যান্সার যা পূর্ণ অবস্থায় অর্থাৎ (কোষ এর পরিবর্তন ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার আগেই সনাক্ত করা যায় "ভায়া" (VIA-visual inspection cervix by acetic acid) পরীক্ষা দ্বারা। সফলভাবে চিকিৎসার মাধ্যমে সারভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব।

স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করে চিকিৎসা করালে নিরাময়ের

সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিন ধরনের ধরনের পর পরীক্ষা পদ্ধতির (নিজে নিজে স্তন পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসক দিয়ে স্তন পরীক্ষা, মেমোগ্রাফি) মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়।

সরকার চিকিৎসা সেবা, মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন এর লক্ষ্যে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। জরায়ু - মুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়য়ের অধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় "establishment of national center for cervical and breast cancer screening and tracing in BSMMU" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জরায়ু - মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কর্মসূচীর কার্যক্রম প্রসারিত হচ্ছে। সারা দেশে প্রায় ৩৯০ টি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র (বি.এস এম এম ইউ জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ও হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল,মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত উপজেলা কমপ্লেক্স) বিনামূল্যে জরায়ু- মুখ ও তসন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা প্রদান করছে। প্রতিবছর প্রায় দুই লক্ষ মহিলার জরায়ু - মুখ (ভায়া) পরীক্ষা হচ্ছে এর মধ্যে প্রায় ১০,০০০(৫০%) মহিলার জরায়ু- মুখ পজিটিভ হিসাবে সনাক্ত করা যায়। সকল ভায়া পজিটিভ মহিলাদের কল্পোস্কপি পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সমূহে প্রদান করা হয়।

আমাদের সচিবালয় ক্লিনিকে সীমিত গন্ডির মাঝে via (ভায়া) ও CBE (সি বি ই) ব্যাবস্থা চালু হয়েছে। সপ্তাহ প্রতি বুধবার (সপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত) এখানে পরীক্ষা করা হয়। ভায়া নেগেটিভ হলেও এটি ৩ বছর পর পর মহিলাদের করা অত্যাবশ্যকীয়। আর পজিটিভ হলেও চিন্তার কোন কারণ নেই, কলস্কপি করার জন্য রেফার্ড করে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো হয়।

লেখক পরিচিতি
জুনিয়র কন্সালট্যান্ট (গাইনি এবং অবস)
বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট ক্লিনিক, ঢাকা।

অটিজম- চাই সচেতনতা

আছমা সুলতানা (বন্যা)

আমি তখন ছোট, যতদূর মনে পরে বয়স ছিল ৯ কিংবা ১০। আমার গ্রামে এক অন্ধ বয়স্ক মহিলা ছিলেন, তিনি ভিক্ষা করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। কি কারণে জানি না, সেই মহিলার প্রতি ছিল আমার অপার মমত্ববোধ। ঠিক মনে নেই কতদিন যে স্কুল ফাঁকি দিয়ে তার লাঠি নিজ হাতে নিয়ে তাকে ধরে ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি। গ্রামকে গ্রাম, পথকে পথ, সেই থেকেই Disability'র সাথে আমার পথ চলা। আমি এখনো আমার নিজস্ব সময়ে, নিজস্ব আঙ্গিনায় Disability নিয়ে ভাবি, কিছু না কিছু করার চেষ্টা করি। আমার চারপাশের যারা আছে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি। সেই তাগিদ থেকেই মূলতঃ আজকে অটিজম বিষয়ে এই লেখা।

অটিজম কোন রোগ নয় বা মানসিক ব্যাধিও নয়, এটি হচ্ছে মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা। এই রকম প্রায় ২২টির মতো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা আছে, সেগুলোর লক্ষণও প্রায় অটিজমের মত। অটিজম কি? কেন হয়? কেন দিন দিন অটিজমে আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে? অটিজম হলে করণীয় কি? অটিজম সম্বন্ধে এই সমস্ত ছোট ছোট প্রশ্নের ধারণা থাকা সবারই দরকার। আপনার বলয়ে কোন না কোন স্থানে অটিস্টিক শিশুর বাবা-মা অবস্থান। বিধাতা না করুক এই বলয়ে যেন অটিস্টিক শিশুর বাবা-মায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। দেশের প্রায় ১০% লোক কোন না কোন ভাবে Disable. তাদের মধ্যে অটিজম অন্যতম। কিন্তু চারপাশের লোকজনের অসহযোগিতা, অটিস্টিক সন্তানের বাবা-মার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, অবহেলার কারণে রাস্তায় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাদের অটিস্টিক বাচ্চাদের কম দেখি। অথচ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, সবার ভালোবাসাই ওদেরকে ওদের ভুবন থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অটিস্টিকরা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত আবিস্কার, তথ্য, খেলা, শিল্প, সাহিত্য ও গবেষণায় যাঁরা পরিবর্তনের ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রায় ৪০ শতাংশই অটিজম, Asperger's syndrome অথবা ADHD-তে আক্রান্ত ছিলেন।

অন্য সকল Disability কোন না কোনভাবে সনাক্ত করা যায়। কিন্তু অটিজমে আক্রান্তরা দেখতে আরও ৮/১০টা স্বাভাবিক মানুষের মতই কিন্তু সামাজিক যোগাযোগের দক্ষতা কম হওয়ায় তাদের আচরণগত বিশেষ ভিন্নতাকে আমরা ভুল

বুঝি, ওদেরকে অবহেলা করে দূরে ঠেলে দেই। অবহেলা নয় ওদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আগলিয়ে রাখতে হবে। অটিজমের কারণ এখনো উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়নি জানার কেন মেয়ে শিশুর থেকে পাঁচ গুণ ছেলে শিশুরা অটিজমে আক্রান্ত হয়। প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্যই একজনের থেকে অন্যজনের আলাদা। প্রগতিশীল এ বিশ্বে এখন পর্যন্ত অটিজম একটি অনিরাময়যোগ্য প্রতিবন্ধকতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও থেরাপির মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুরা অনেকটাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

আমেরিকান সোসাইটি অব অটিজম এর মতে, পুরো আমেরিকায় অটিজমের তথ্য নিম্নরূপঃ

১৯৭০	প্রতি ১০,০০০ জনে ১ জন
১৯৭২	প্রতি ৫,০০০ জনে ১ জন
১৯৮৫	প্রতি ২,৫০০ জনে ১ জন
১৯৯৫	প্রতি ৫০০ জনে ১ জন
২০০১	প্রতি ২৫০ জনে ১ জন
২০০৪	প্রতি ১৬৬ জনে ১ জন
২০০৭	প্রতি ১৫০ জনে ১ জন
২০০৯	প্রতি ১১০ জনে ১ জন
২০১২	প্রতি ৮৮ জনে ১ জন
২০১৩	প্রতি ৬৩ জনে ১ জন
২০১৫	

বাংলাদেশে এখনো কোনো সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও অটিজমে আক্রান্তদের হারে খুব বেশি ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না। অটিজম ছাড়াও মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যার হারও এখন প্রতি ২০ জনে ১ জন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে হারে অটিজমে এবং অন্য বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশু বাড়ছে বিধাতা না করুক অদূর ভবিষ্যতে আপনারঅথবা খুব কাছের কারো ঘরে জন্ম নিতে পারে এ ধরনের দেব শিশু। অবহেলা নয়, অটিস্টিক শিশুদের বাবা-মায়ের দিকে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিন। ওরাও হতে পারত আপনাদেরই কাছের কেউ। অটিস্টিক বাচ্চাদের বাবা-মা বিশেষ করে মায়েরা এতটাই নিদারুন কষ্টে থাকে যে, অন্য কোন অটিস্টিক বাচ্চার বাবা-মা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সেই ব্যথা বুঝাই সম্ভব নয় এদের মধ্যে প্রায় মায়েরই কথা, মায়ের মৃত্যুর আগের যেন তার অটিস্টিক সন্তানের মৃত্যু হয়। ভেবে দেখুন তো, যে জন্মদাত্রী মা এতটা কষ্ট করে তাকে জীবন দিয়েছে, কতটা কষ্ট করে লালন পালন করিয়েছে কতটা, ক..ত টা কষ্ট বুকে থাকলে তারা এই কথাগুলো

বলতে পারে। আমরা তাদের প্রতি আরো বেশি সহমর্মী হই না কেন? তাকে যেন তার বাচ্চা নিয়ে বাইরে বের হলে সহস্র বিরক্তিকর চোখ, অনাকাঙ্খিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়।

অটিজম নিয়ে আমার এতটা উদ্বেগ এর পিছনে অন্তর্নিহিত কারণও আছে। ২৭শে আগস্ট ২০০৪ বিকেল ৩.৩০ টা জন্ম নেয় আমার দ্বিতীয় সন্তান অর্থাৎ আমার ছেলে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমি একজন পরিপূর্ণ মা। আস্তে আস্তে দিন যায়, মাস যায়, দিনকে দিন আমার পরিপূর্ণতা বাড়তেই থাকে আমার সন্তানদের নিয়ে। আমার ছেলে কথা বলে, দুষ্টুমি করে সবই ঠিক কিন্তু কোথায় যেন মনে হয় সুরের সাথে তাল ঠিক নেই। সেই থেকে অটিজমের সংগে পথ চলা। অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার ২২টি ডিসঅর্ডারের মধ্যে আমার ছেলের অল্প পরিসরে একটি ডিসঅর্ডার আছে যার নাম Attention Deficiency Hyperactive Disorder (ADHD) with Difficulty (LD). ছেলেকে নিয়ে অনেক কষ্ট করেছি, এখনও করছি, প্রতিনিয়ত এই কষ্টের সাথে থেকে জীবনের অন্য একটা রূপের সন্ধান পেয়েছি, পেরেছি জীবনকে পরিপূর্ণ করতে। তখন থেকেই Invisible এই Disability নিয়ে চারপাশের সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। আজ আমার সমাজে একটা ছোট্ট অবস্থান আছে, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের সাথে মিশছি, চলছি। আমি চাইলেই আরও কয়েকজনকে অটিজম বিষয়ে সচেতন করতে পারি। আমি বা আমার মতো আরোও যারা আছে তারা যদি এগিয়ে না আসি তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত হাজারো অটিস্টিক বাচ্চার মায়েদের কথাই বা কে বলবে?

আমার সকল চেতনায় এই মায়েরা থাকে। মাস ছয়েক আগের কথা, মাগরিবের আযানের সময় আমাকে এক অটিস্টিক বাচ্চার মা (আশিকের মা) ফোন করে বলল, ভাবী আজ আমি রোজা রেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম কেন? উত্তরে উনি বললেন (উনার ১৬ বছর বয়সী অটিস্টিক ছেলে) "আমি যদি মরে যাই, আসিককে কে দেখবে, ছেলেটা কিছু বুঝাবে না, বলে বুঝাতেও পারবে না, রাস্তার লোকজন ওকে তাড়িয়ে ফিরবে, ওকে রেখে আমি মৃত্যুর সময় চোখ বন্ধ করতে পারব না, আজ আল্লাহর কাছে দোয়া করব যেন আমার মৃত্যুর আগে ওর মরণ হয়। আমি শুধু এই

কথাটা আপনাকেই বললাম। আপনিও দোয়া করবেন।" কি যে অদ্ভুত কারণে বিধাতা মায়ের দোয়া এক মাসের মধ্যে কবুল করলেন। আশিক এক মাসের মাথায় ঘুমের মধ্যে হার্ট এট্রাক করে মারা গেছে। আশিক মারা যাওয়ার পর ঐ ভাবীর যে আর্তনাদ দেখলাম আজ পর্যন্ত কত মানুষকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখেছি, কত মায়ের বুক খালি হওয়া দেখেছি কোথাও মেলাতে পারিনি সেই আর্তনাদ। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি ওনার সামনে যেতে সাহস করিনি। আমি ভালো লিখি না..... আমি ভালো জানিওনা, তবুও মনে হলো এই কথাগুলো সবাইকে জানানো দরকার। এ অবুঝ সন্তানের জন্মদাত্রী পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে এই সন্তান তোমাদের একার না, ওকে নিয়ে যে আনন্দ, কষ্ট তার ভাগ আমাদেরও, আর কিছু না হোক এই সান্তনা টুকু অসহায় এই বাবা-মাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

উন্নত বিশ্বে হয়ত সরকারই বিভিন্ন Disability তে আক্রান্ত জনগণের ব্যাপারে সচেতন। আমাদের দেশে হয়ত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সরকারের তরফ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ অটিজম বা অন্য প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যতটা আলোচনায় এসেছে, পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিভিন্নভাবে মিডিয়ায় চলে এসেছে সেটাই বা কম কিসে। তবুও আমাদের নিজেদের সচেতনতাই Disable দের এগিয়ে নিতে পারে বহুদূর। ২রা এপ্রিল ২০১৪ ৭ম অটিজম সচেতনতা দিবসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অটিজম বিষয়ক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদফতর এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স এর ফলক উন্মোচন কালে এক অটিস্টিক শিশু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সকল নিরাপত্তার বাঁধা ডিঙ্গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি যে আকুলতা নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাকে স্টেজে নিয়ে পাশে বসিয়েছেন। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এত সুন্দর, এত অর্থবহ সময় কাটিয়েছেন বাচ্চাটির সংগে, সে অর্থবহ সময় কাটানোর উপায় হয়ত অনেক অটিস্টিক বাচ্চার মায়েদেরও জানা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি একটা দেশের এত ভার নিয়েও অটিজম এর ব্যাপারে এতটা সচেতন থাকেন তাহলে আমরা কি এ ব্যাপারে একটু একটু করে সচেতন হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হতে পারি না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব পিতা-মাতার চোখের অভিব্যক্তিতে বুঝলাম অটিস্টিকদের অভিভাবকদের কোন দল নেই, কোন ধর্ম নেই ..... ওরা শুধু ওতেই খুশী আমার অটিস্টিক বাচ্চা দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশের চেয়ারে বসে আছে। প্রধানমন্ত্রী তাকে

আদর করে মাথায় হাত রেখেছেন। ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ঐদিন যে ভালবাসা আপনি দেখিয়েছেন সারাটা জীবন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের প্রতি আরো সহনশীল, ভালবাসা দেখানোর ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আসুন না, আমরাও একটু একটু করে ভালবাসা দিয়ে ওদেরকে জানতে শিখি।

কয়েক দিন আগে অফিস থেকে ফেরার পথে হাতিরঝিল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার এক সহকর্মীর বাবা তার পঁচিশোর্ধ্ব অন্ধ ছেলেকে নিয়ে হাতিরঝিলের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। ওনি প্রায় প্রতিদিন ওনার ছেলেকে নিয়ে হাতিরঝিলে বা অন্য কোন খোলা জায়গায় বেড়াতে যান। মনে হচ্ছিল ওনি ওনার চোখ দিয়ে ওনার ছেলেকে পৃথিবীর অপরূপ ভালোবাসা, বাতাস, আলো স্পর্শ করাচ্ছেন। তারপর থেকে যতক্ষণ আমি হেঁটেছি, চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। এর থেকে কি আর নেক কাজ হতে পারে। আমি নিশ্চিত বিধাতা নিশ্চয়ই এই সকল বাবা-মাদের বেহেশতবাসী করবেন।

বছর দেড়েক আগের কথা, আমি আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে গুলশান প্রেসিডেন্ট পার্কে (লেডিস পার্ক) বেড়াতে গিয়েছি। প্রায় সত্তোর্ধ্ব বয়সী এক পিতা তার ২৫/২৬ বছরের প্রায় ৬ ফুট লম্বা অপূর্ব সুন্দর অটিস্টিক সন্তানকে নিয়ে হাঁটতে এসেছেন। ভদ্র লোককে দেখে মনে হচ্ছিল সে হয়ত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। অটিজমের স্বভাব সুলভ আচরণের কারণে তাঁর ছেলেটি মুখ দিয়ে অর্থহীন অদ্ভুত শব্দ করছে, এই হাঁটছে, এই দৌড়াচ্ছে, যা তার এই বয়সী বাবা তাল মিলাতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠছেন। লোকটি তার সন্তানকে নিয়ে হাঁটার সময় অনেকেই বিরক্ত হচ্ছে কেউবা অদ্ভুত ভাবে ওনার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক ছেলের অস্থিরতার কারণে একশ ভাগের বিশ ভাগ কষ্ট পাচ্ছেন আর বাকী আশি ভাগ কষ্ট পাচ্ছেন লোকজনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। অথচ আমরা কে না জানি এই অভিজাত পার্কে আমাদের তথাকথিত সচেতন নাগরিকরাই হাঁটতে যায়। খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। অবশেষে বাচ্চাদের খেলার জায়গার পাশে বহু কষ্টে তার ছেলেকে বসিয়ে একটু আশ্বস্ত হতে হতে দেখলেন ওনাদের পাশে আমার বাচ্চারা খেলা করছে। কি যে আকুতি নিয়ে উনি আমার দিকে তাকালেন যার ভাষা ছিল "মা তোমরা বিরক্ত হচ্ছ নাতো"। আমি সে চাহনি আজও ভুলিনি। ওনার তাকানোর উত্তরে আমি একটু মুচকি হেসে ওনাকে আশ্বস্ত করলাম। খেয়াল করলাম সে হাসিতে ওনার চেহারা থেকে সকল গ্লানি মুছে গিয়ে ওনার বয়স কমপক্ষে দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে।

আমরা কি একটু মুচকি হাসি দিতে পারি না। ভালোবেসে অটিস্টিক বাচ্চা/ বড়দের মাথায় একটু হাত রাখতে পারি না। ওদেরতো আমাদের কাছে বেশী কিছু চাওয়ার নেই। আমাদের ভালবাসার হাত দিয়েই ওদেরকে আমরা আলবার্ট আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন, মোজার্ট, চার্লস ডারউইন, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো বা বিল গেটস্ এর মত বিশিষ্টজন বানাতে পারি। যেটা হয়ত আমার/আপনার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

আমি স্বপ্ন দেখি, কোনো আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নয়, খুব ছোট্ট স্বপ্ন। সবার সহযোগিতা একটি Physically Disable লোক বাহিরের জগতে ঘুরে বেড়াবে, অন্ধ লোক পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ স্বাচ্ছন্দে নিবে, বধির লোকের ভাষা আমরা সবাই বুঝতে পারব, এমনি প্রতিটি অটিস্টিকের দৃষ্টি ভঙ্গিটা আমরা তাদের মত বুঝতে পেরে তাদেরকে তাদের জগত থেকে বের করে আমাদের জগতে নিয়ে আসব। অল্প অল্প করে আমরা ওদেরকে জানতে শিখব, বুঝতে শিখব। নিজেদের সন্তানদের বুঝাতে সক্ষম হব। আমার বা আমার মত আরো অসংখ্য মায়ের বিশ্বাস ও ভালবাসা থেকেই বলছি আমার সতীর্থরা পারবে আমার স্বপ্নকে কমপক্ষে এক ধাপ এগিয়ে নিতে।

লেখক পরিচিতি
উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

নারীর সক্ষমতার সাতকাহন

হোসনে আরা রিনা

লিঙ্গান্তর করলে নারী শব্দটি পুরুষ শব্দটির বিপরীত লিঙ্গ। নারী শব্দটির বিভিন্ন প্রতিশব্দ রয়েছে। কন্যা, মেয়ে, মহিলা, মা, নানী, দাদী, বউ, ননদ, বোন, ভাগ্নি, চাচী, মামী, খালা, ফুপু শব্দগুলো নারী শব্দটিরই বিভিন্ন রূপ। এ শব্দগুলোই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে নারী শব্দে রূপ নিয়েছে। মহিলা শব্দটির রূপান্তরিত রূপই হলো নারী। যতদূর জানা যায় মহিলা শব্দটি এসেছে মহল অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে। এক কালে রাজপ্রাসাদে দাসী রাখা হতো। রাজা-বাদশাহ রা তাদেরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন। যেহেতু জীবনের অধিকাংশ সময় মহলেই দাসীগণের অবস্থান ছিলো, তাই তাদের মহিলা বলা হতো। মহিলা থেকে নারীতে উত্তরণ তাদেরকে মর্যাদার জায়গায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজও মহিলা শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি নারীর সক্ষমতা অর্জনে একটি বড় অন্তরায়। আদিকালে মানুষকে অনেক কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। পশু শিকার করতে হতো খাদ্য সংগ্রহের জন্য। শারীরিক গঠন শৈলীর কারণে মেয়েরা বড় বড় পশু শিকার করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতো। যেহেতু খাদ্যের জন্য মেয়েদেরকে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হতো এবং তখন থেকেই পুরুষেরা মেয়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো। অথচ নারীরাই কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভাবক। বংশবৃদ্ধির জন্য নারীরা গর্ভে বাচ্চা ধারণ করে। গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক বাদ্যবাধকতার কারণে অনেক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। সন্তান গর্ভে ধারণ ও ভূমিষ্ট হওয়ার পর লালন-পালন করতে মায়েদের অনেক কষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সমাজের মানুষেরা মহা মূল্যবান এ কাজটির জন্য মায়েদেরকে সঠিক সম্মান প্রদর্শন করেনা। পুরুষ শাসিত এ সমাজে অনেক নারী আছেন যারা নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নন বা পুরুষদের সুবিধার্থে তৈরী বিধি-নিষেধ অকপটে সমর্থন করেন। অনেক নারীরা নিজেরাই ধরে নেয় কাজটি তারা পারবেনা। ফলে পুরুষের তুলনায় তারা পিছিয়ে যায়। খুব ছোটকাল থেকে পুরুষের আধিপত্যবাদের মধ্যে বড় হতে হতে নারীরা তাদের নিজেদের অজান্তেই মনের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতা নিজেরাই বহন করে। এধারা থেকে নারীদের বেরিয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে দিন পাল্টাচ্ছে। নারী সমাজ অনেক সচেতন হচ্ছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-বানিজ্য, আইন, বিচার, স্থানীয় সরকার, সরকারী-বেসরকারী চাকরী সর্বক্ষেত্রে নারীরা বিচরণ করছে। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অনেক স্তরে নারীরা এগিয়ে গেলেও সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নীতি নির্ধরণী পর্যায়ে

নারীর অংশগ্রহন অনেক কম। সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীকে অতিক্রম করতে হবে অনেক বন্ধুর পথ। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা গেলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করার উৎসাহ পাবে। বিরাট নারী সমাজকে বাদ দিয়ে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃনমূলে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। সাবলীলভাবে সব কিছু উপস্থাপন করতে হবে।

তৃণমূল থেকে সমাজের উঁচু স্তর নারীর ক্ষমতায়ন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা তাদের নায্য দাবী হতে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীরা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান কাজ করা সত্ত্বেও বেতন বৈসাম্যের শিকার হন। নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই কম বেতন পান। কর্মক্ষেত্রে নারীর মাতৃত্ব কালীন ছুটিকে তার স্বাভাবিক ছুটি মনে না করে বাড়তি দেয়া হয়েছে মনে করা হয়। কর্মজীবি নারীরা সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও সাংসারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কারণে নিজেদের ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে পারেনা। চাকুরী জীবি নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তার জন্য আইন প্রনয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহন থাকলেও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীকে দূরে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর পদটিকে অলংকারিক পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পরিবারের ছেলে সন্তান টিকে ছোটকাল থেকেই নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে হবে। নারীরা আজ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, সমাজের সর্বস্তরে তাদের কাজ করার সক্ষমতা রয়েছে।

লেখক পরিচিতি

অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (আমদানি)
উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা

সাগরকন্যার সান্নিধ্যে

সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

সময়টা অতীত সেই ২০০৩। সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকেছে। আমি তখন মনে মনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি, অর্থাৎ কল্পনায় আমি পারিযায়ী পাখি। কেন? সুযোগ আর সামর্থ্য দু'টোই আমার কাছে অধরা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একবার সুযোগ হয়েছিল কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দারবান আর সেন্টমার্টিন ঘুরে আসবার; সেই প্রথম আর এ পর্যন্ত সেই ছিলো শেষ।

পত্রিকার পাতায় প্রায়ই ফিচার ছাপা হয় পর্যটনের নতুন দিগন্ত কুয়াকাটা, যার বিশেষত্ব এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। মনে তখন থেকেই একটা যাই যাই তাগিদ- কবে যাবো স্বপ্নের মতো সেই জায়গাটায়। কেটে গেল অনেকটা সময় এর মধ্যেই কাংখিত মেঘ জল হয়ে ঝরার মতো করে সুযোগ এলো কুয়াকাটা বেড়াতে যাবার। মনের আকুতি তখন অস্থিরতার রূপ নিয়েছে, কবে আসবে সেই মহেন্দ্রক্ষণ, কিভাবে যাবো কে কে যাবে সব কিছুতেই আমার ভীষণ কৌতুহল। ও আচ্ছা সুযোগটা কিভাবে এলো তাইতো বলা হয়নি। আমার বোন আর তাঁর বন্ধুকুলের সাথে আমি অতিথী। যাই হোক দিন গুনে গুনে অবশেষে এলো সেই সন্ধ্যে, আজ আর তার দিন, তারিখ, বার, মনে নেই শুধু ক্ষণটা মনে আছে- আমরা ঢাকা থেকে সন্ধ্যে ৭ টার লঞ্চে সাগরকন্যা পটুয়াখালির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ছিলাম। লঞ্চটা খুব বড় ছিলোনা; মাঝারী আকরের একটি লঞ্চ- এখন আর তার নাম মনে করতে পারবোনা। আমরা তিনটি কেবিনে আমাদের অস্থায়ী সংসার গুছিয়ে নিয়েছিলাম। তখনও বুড়িগঙ্গা অতটা বুড়িয়ে যায়নি। অর্থাৎ এখনকার মতো মুমূর্ষ ছিলোনা। কাকচক্ষু টলটলে না হলেও কুচকুচে কালোকাঁদা জল তখন কল্পনায়ও ছিলোনা। আমরা কেবিন ছেড়ে খোলা ডেকেই বেশিটা সময় কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যে শেষে রাত নামলো-পূর্ণ না হলেও পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে এমন চাঁদ আমাদের সঙ্গ দিচ্ছিলো। জলের আয়নায় চাঁদের আলো কোমল দ্যুতি ছড়াচ্ছিলো সাথে এলোমেলো বাতাসের শীতলতা আর চা উচ্ছল আড্ডার আবহ, তাই আড্ডাও চললো জলতরঙ্গেও সাথে পাল্লা দিয়ে। সময় গড়িয়ে তখন প্রায় মাঝরাত না আর আড্ডা চলবে না মনের কান্তিতো জলের স্রোতে ভেসে গেছে শরীরকেতো একটু বিশ্রাম দিতে হবে। তাই অনেকটা অনিচ্ছা সত্বেও ঘুমুতে গেলাম; কেননা ভোর ভোর তরী ঘাটে ভিরবে আর আমাদেরও পথে নামতে হবে।

হয়তো অবচেতন মনের তাগিদ থেকেই খুব ভোরে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দলে আমরা মোট ৬ জন এবং কুয়াকাটায় প্রথমবার যাচ্ছি তাই সবার মনে উত্তেজনা প্রায় একরকম। সম্ভবতঃ সকাল ৬ টার দিকে আমরা পটুয়াখালী নামলাম। এরপর যান কি হবে আমরা আগে থেকে ঠিক করিনি। পটুয়াখালী নাস্তা করে নিতে নিতে আমরা কুয়াকাটা কিভাবে যাবো তাই নিয়ে আলোচনা করলাম, প্রথমে সকলেই বাসে

যাওয়ার বিষয়ে একমত হলেও সময় সাশ্রয়কে প্রাধান্য দিয়ে পরে আমরা মাইক্রোতেই সয়ার হলাম।

আবার যাত্রা শুরু। মাইক্রোবাস চলছে, পথ খুব মসৃন না এখানে সেখানে এবরো-থোবরো আর খানাখন্দতো আছে। আমরা কখনও দুলছি, কখনও ঝাঁকি খাচ্ছি। পথের দু' ধারে ঘন গাছের সারি, গাছের ফাঁক গলে দু'একটা বাড়ির উঠোন আবছা চোখে পড়ছে। মঝে মাঝেই জলাধার অথবা পুকুর, এখানটায় প্রায়ই গোলপাতা দেখা যায়। হয়তো সাগরের নুনাজলের কিছুটা প্রভাব এখানকার মাটিতেও আছে।

পটুয়াখালী থেকে কলাপাড়া যেতে তখন তিনটি ফেরী পার হতে হতো অর্থাৎ তিনটি নদী তার মধ্যে একটির নাম আবার আন্ধার মানিক, কি অদ্ভুদ সুন্দর নাম তাই না। এমন নামকরণের কারণ কি বিষয়টা তখন থেকেই আমাকে ভাবাচ্ছিল। ভাবনার অবসানও ঘটলো শীঘ্রই, নদীর পানিতে প্রচুর ফসফরাস যা অন্ধকারে জ্বলে এ থেকেই নাম আন্ধার মানিক। বেলা ১২.৩০ নাগাদ আমরা কলাপাড়া অর্থাৎ কুয়াকাটা পৌছাই। এখন এই সময়ে এসে মনে হয় আমরা কতটা অনিশ্চয়তা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ছিলাম। হয়ত অভিজ্ঞতার অভাবই এর কারণ। কেন বলছি?- আমরা কোন হোটেল বা রিসেটি আগে ভাগে বুকিং না করেই কুয়াকাটা বেড়াতে চলে গেলাম। এখন মনে করতে পারছিনা তবে সময়টা তখন হয়ত পর্যটন সিজন ছিলনা তাই আধ-ঘন্টার চেস্টায় একটি নবনির্মিত হোটেলে আমরা একই ফোরে তিনটি রুম পেয়ে গেলাম। আসলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো বলতে হবে, আমাদের হোটেল রুমের বারান্দা থেকেই সমুদ্র দেখতে পারছিলাম, শুনছিলাম সমুদ্রের ডাক। না এই ডাক আর বেশিক্ষণ উপেক্ষা করা গেল না। আমরা চটজলদি ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বেড়িয়ে পরলাম; রথ দেখা ও কলাবেচা একসাথে হবে অর্থাৎ দুপুরের খাওয়া ও সমুদ্রদর্শন। সময় এখন দুপুর গড়িয়ে যায় প্রায়। সৈকতের ধার ঘেষে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা একটা রেস্টুরেন্ট খুব ভীড় ভাট্টা নেই- গিয়ে মেন্যু জানতে চাইলে জানালো তাজা সামুদ্রিক মাছ আছে, পছন্দসই মাছ নগদ নগদ ভেজে দিবে সাথে সবজি আর ডাল। সকালের নাস্তাটা খুব একটা যুতসই হয়নি-খিদে তাই বেশ জোরেসোরেই জানান দিচ্ছিল। আমরা খাবার অর্ডার করে সমুদ্রের দিকে মুখ করে নিয়ে বসে গেলাম, না হোক সাগর ছুঁয়া অন্তত: দেখতেতো পারছি। সামুদ্রিক মাছ আর সাগরের হাওয়া দুপুরের খাওয়াটা মন্দ হয়নি। পেটপূজা শেষে সমুদ্রের কাছে ছুটে যাওয়া। কথা ছিলো সাগরকে কাছ থেকে দেখে এ বেলা ফিরে আসবো, কিছু সময় বিশ্রাম করে বিকেলে আবার আসবো সমুদ্রের কাছে, তখনই হবে সমুদ্র অবগাহন। না আমরা আমাদের কথা রাখতে পারিনি সাগরের সম্মোহণ ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়ে সাগর জলে তখনই নিজেদের সঁপে দিলাম। তারপর সময়ে হিসেব ভুলে গিয়ে বিকেলটা পুরোপুরি সাগরের সাথে কাটিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যের মুখে আমরা হোটেল রুমে ফিরে এলাম। কিছুটা সময় রুমেই কাটিয়ে দিলাম তারপর সন্ধ্যে যখন রাত্রিকে আহবান করছে তখন আবার আমরা বের হলাম। সৈকতের ধারে বসে চা আর আড্ডায় রাত্রির অনেকটা কাটিয়ে দিয়ে একেবারে

রাতের খাওয়া শেষ করে ফিরে এলাম। এর মধ্যেই অবশ্য পরদিনের সিডিওল ঠিক করে নিলাম। ভোর বেলা অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই গঙ্গামতির তীরে পৌঁছুতে হবে সূর্যোদয় দেখতে। সেই মতো ভ্যান ঠিক করে রাখা হয়েছে।

পরদিন ভোর ৪.০০ টায় উঠে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। সময়ের হিসেবে তখন ভোর হলেও রাত্রি তার ছাইরঙ্গা চাঁদর বিছিয়ে রেখেছে। আমরা ভ্যানে করে মেঠোপথ দিয়ে চলছি ছাইরঙ্গা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। আলো আধারীর এই সময়ে পথের দুধারের গাছপালাকে ঘনবনানী বলে ভুল হয়। আমাদের হোটেল থেকে গঙ্গামতির দুরত্ব খুব বেশি নয় ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা গোমতির চরে পৌছে গেলাম। আমাদের মতো অনেক প্রিয়াসী পর্যটক এখানে ভীড় করেছে।একই উদ্দেশ্যে- কিন্তু যার জন্য সকালবেলা ঘুমসুখকে বির্সজন দেয়া তার পাত্তা মিলছিলনা। তবে কি আজ সুয্যিমামা ধরাধামে দেখা দিবেন না, না তাইবা কি করে হয়। তবে যে আর সকাল হবে না। সঠিক সময়ে সকালও হলো, সূর্যোমামাও ধরাধামে নেমে এলেন; শুধু আমরাই তার আগমনের রাজসিক আয়োজনের সাক্ষী হতে পারলামনা। কি অকারণ গোপনীয়তায় একটি মেঘের পর্দার আড়াল নিয়ে সূর্য সেদিন পৃথিবীতে নেমে এলো। আর আমরা আমাদের মন্দ ভাগ্যকে সাথে নিয়ে ফিরে এলাম।

তখন সকাল সবে চোখ মেলে সূর্যকে দেখছে, আমরা আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে সাগর জলে পা ভিজিয়ে সমুদ্রের গর্জন শুনছিলাম। দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের জল ভোরের ছাইরং চাদর পাল্টে নিয়ে প্রথমে সোনা রঙের চাদরে নিজেকে জড়িয়ে দেখে কেমন লাগছে পরক্ষণেই আবার রুপোলী চাদরখানাই তার মনে ধরে এবং রুপা রঙে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আনমনে ছুটে চলেছে। সমুদ্রের এই সাঁজগোজের বাহার দেখতে দেখতে আমাদের সকালের নাস্তার সময় হয়ে এলো আমরা সৈকত থেকেই গরম গরম ভাজী আর পরটার ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। ঘ্রাণে ক্ষিদে আরো চনমনিয়ে উঠলো। না আর দেরি করা ঠিক হবেনা, আমরা ঝটপট রেস্তোরায় ঢুকে পরলাম; আয়েস করে নাস্তা তারপর চা, খাওয়ার পাট চুকলে আমরা হোটেল ঘরে ফিরে তৈরি হয়ে নিলাম পরবর্তী যাত্রার- এবার লক্ষ্য মিশ্রিপাড়া। মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত, এছাড়া রয়েছে রাখাইন পল্লী। বেলা ০৯টা নাগাদ আমরা মিশ্রিপাড়ার উদ্দেশ্যে, বাহন তিন চাকার ভ্যান, সরু মটির রাস্তা একধারে সমুদ্র আর ঝাউয়ের বন অন্য ধারে স্থানীয় বাসিন্দাদের আবাস। নানান ধরনের গাছগাছালীতে ঢাকা পড়ে আছে। আমাদের প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় লেগে গেল মিশ্রীপাড়া পৌঁছুতে। প্রথমে আমরা বৌদ্ধ মন্দিরে গেলাম মন্দিরটির নাম সীমা বৌদ্ধ বিহার। বেশ উঁচু বেদীর উপর আসন করে বুদ্ধ বসে আছেন তার বিশাল অবয়ব নিয়ে। মন্দিরের ভেতরটা কিছুটা অন্ধকার, বুদ্ধকে নিবেদন করে ভক্তদের জ্বালানো মোমবাতির আলোয় ঘরটিতে যেন আলো আধাঁরীর লুকোচুরি চলছে। আমরা এখানটায় খুব বেশি সময় কাটালামনা, চললাম রাখাইন পল্লীতে। এখান থেকে হাঁটাপথ। উচুঁ কাঠের মাঁচা তার উপর ঘর। এটা তাদের ঐতিহ্য; আগে এটা প্রয়োজন ছিলো; যখন সভ্যতা ছিলো সুদুর পাশ্চাত্যে তখন বন্যজন্তু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর

আক্রমণ থেকে বাঁচার প্রয়োজনেই এমনতর ব্যবস্থা। এখন সভ্যতার আগমনে সেসব ভয়ভীতি না থাকলেও তারা তাদের ঐতিহ্যকে লালন করছে এভাবেই। রাখাইন পল্লীতে ঢোকা অব্দি একটা মৃদু খটখট শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এক তালে বেজে চলেছে। খটখট শব্দটা কিন্তু আবার মোটেও খটমটে না। শব্দের উৎস কোমড় তাঁত। প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে এক বা একাধিক কোমড় তাঁত। সরাদিনই প্রায় কেউ না কেউ তাঁত বুনে চলেছে। আগে শুধু নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে তাঁত সচল রাখলেও এখন এটা তাদের আয়ের উৎস হয়ে দাড়িয়েছে। দেশী-বিদেশী সব ধরনের পর্যটকের কাছে রাখাইনদের কোমড় তাঁতে বুনা কাপড়ের বেশ কদর রয়েছে। থাকবেইনা বা কেন একেতো বাহারী রঙের সমাহার তার উপর দামে কম। আমরাও রথ দেখা আর কলাবেচা সেরে নিলাম অর্থাৎ কেনাকাটা করলাম।

মিশ্রীপাড়া বেড়িয়ে আমদের ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় ১২ বেজে গেল। এরপর একমাত্র কাজ সমুদ্র স্নান যেহেতু পরদিন ভোরে আমরা কুয়াকাটা ছাড়বো তাই আজ যতটা পারি সমুদ্রের সাথে সময় কাটাবো সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ভেসে বেড়াবো। সবাই মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে সৈকতে চলে এলাম, এরপর সমুদ্রের মাদকতা আর মাতাল হাওয়ায় ঘড়ির কাটা কোথায় কখন ঘন্টা বাজাচ্ছে কারোই যেন হুস নেই, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে ধরল পেট জানান দিচ্ছে সময় কতটা পার হলো। এক সময় সময়ের হাত ধরে আমরা সমুদ্র স্নানের ইতি টানলাম। এরপর হোটেলে ফিরে গোসল সেরে আবার বেড়িয়ে পড়লাম- দুপুরের খাবার খাব বলে। বলছি দুপুরের খাবারের কথা সময় কিন্তু তখন বিকেলের দ্বারে। যাই হোক আজ অবশ্য মেন্যু আগে থেকে ঠিক করা - রূপচাঁদা ফ্রাই, সব্জী আর ভুনা ডাল। পেটপুঁজা ভালোই হলো। গল্পে আর আড্ডায় খাওয়া শেষ হতে প্রায় ঘন্টা খানিক লেগে গেল, এরপর বিকেলও অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে পড়ন্ত বেলার অপেক্ষায় আমরা আবার সৈকতে। বিস্তৃত বালুকাবেলা আর সীমাহীন সমুদ্রের মুখোমুখি বসে অনেকটা মৌনীঋষি হয়ে আমরা বিকেল শেষে সন্ধ্যা তারপর রাতকে বরণ করে নিলাম। আমরা চুপ করে আছি তো কি সমুদ্র কিন্তু অনর্গল বকে যাচ্ছে অথবা ডেকে যাচ্ছে। তরুনী রাত যখন অনেক উচ্ছল আর চঞ্চল তখন আমরা ফেরার জন্য সৈকত থেকে বিদায় নিলাম। আকাশের পূর্ণ চাঁদও যেন আমাদের এগিয়ে দিতে পিছু পিছু এলো।

আমরা একবারে রাতের খাবার খেয়েই হোটেলে ফিরেছিলাম। সে রাতে আর আড্ডা খুব একটা জমলো না মনে হলো যেন কোথায় তাল কেঁটে গেছে। হয়ত প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যের আয়োজন ছেড়ে যেতে হবে বলে সবার মনেই বিরহের সুর আনমনে বাজঁছিলো। আমরা রাত গভীর না করে ঘুমুতে গেলাম কেননা পরদিন ভোরে আমাদের ফিরে চলার আয়োজন আছে।

লেখক পরিচিতি
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

পাঁচ মিনিট সমান সমান

জেবুন্নেছা জেরী

৩০০ সেকেন্ড, ৩০ লক্ষ মিলি সেকেন্ড। সাধারণ কথা, সবাই জানে। কিন্তু পাঁচ মিনিট সমান কত টাকা? নির্ভর করে পেশার উপর। ডাক্তারের পাঁচ মিনিট, উকিলের পাঁচ মিনিট, পরামর্শকের পাঁচ মিনিট, অধ্যাপকের পাঁচ মিনিটের দাম সমান নয়। আবার একই পেশার বিভিন্ন লোকের পাঁচ মিনিটের দামের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। এমআরসিপি, এফআরসিএস আর এমবিবিএস ডাক্তারদের পাঁচ মিনিট সময়ের দামের পার্থক্য সবার জানা তাই লিখিত বলিয়া গণ্য হইল। একইভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পাঁচ মিনিটের দামের পার্থক্য ও "ডিটু"।

আরও বিশেষভাবে দেখতে গেলে একই মানুষের জীবনের সব পাঁচ মিনিটের দাম সমান নয়। না এসব "শুষ্কং কাষ্ঠং" বাদ দিয়ে বরং একটা গল্প বলি। গল্প শেষে আপনারাই বলবেন পাঁচ মিনিটের দাম কত?

আমার এক বন্ধু সপত্নীক বেড়াতে গেছে প্রতিবেশী দেশের নিকটবর্তী শহরে। সে দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। তো আমার বন্ধু মাত্র দুইদিনের জন্য যেয়েই শহর থেকে দুইশ কিলোমিটার দূরের সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর পরিকল্পনা করল। সকালে রওনা দিয়ে দুপুরে পৌছে উন্মত্ত সমুদ্রে হাবুডুবু হোটেলে ফিরে স্নান, পোশাক পরিবর্তন শেষে বিকেলের কনে দেখানো আলোয় রোমান্টিক ফটোসেশন এর পর হোটেলে যেয়ে ক্যামেরা, মোবাইল রেখে গোধুলিলগ্নে সমুদ্রের তীরে বালুকাবেলায় "এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার" এরপর রাতে হোটেল কক্ষে "সাগরের তীর থেকে মিষ্টি কিছু হাওয়া এনে" পরদিন সকালে সাগরতীরে হাত ধরাধরি মর্নিং ওয়াক সেরে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউ চোখে এঁকে সকালের ট্রেনে সাহেব বিবির শহরে প্রত্যাবর্তন।

সে মোতাবেক ট্রেনের সিডিউল মেলানো। বাসে করে যেয়ে ট্রেন ধরবে বলে বাসের রুট চেনা সব ছক করা হলো তিনটি "ই" এর আলোকে। ইকোনোমি, ইফিসিয়েন্সি ও ইফেক্টিভনেস। কাঁটায় কাঁটায় সময় মেলানো, যাকে বলে Failsafe পরিকল্পনা।

"আশা করছে মুলুক জুইরা খোদায় থুইছে বাগুন পুইড়া" সকালে ত্বকের রং পরিবর্তন করতে যেয়ে বন্ধুপত্নী যাত্রার সময়টা মাত্র পাঁচ মিনিট পিছিয়ে দিলেন। ফলাফল কাংখিত বাস মিস এবং রাস্তায় প্রচন্ড যানজট থাকায় পরবর্তী বাসের অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিক্যাব নেয়া (ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া ৪০০ টাকা, বাসভাড়া প্রতিজন ৪০ টাকা) প্রতিবেশী দেশের ট্রেনের চরিত্র নিজের দেশের ট্রেনের মত না হওয়ায় "ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল"। পরবর্তী ট্রেন চার ঘন্টা পরে। ওদিকে তাদের

দুজনকেই যেহেতু সমুদ্র ডাক দিয়েছে সেহেতু তারা বিকল্প হিসেবে বাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্টেশন থেকে স্ট্যান্ডে আসলো (ফেরী ভাড়া ১০ টাকা বাস ভাড়া ১৬ টাকা)। যুগলের দুই প্রান্তেই প্রকৌশলী থাকায় সহজেই ভারসাম্যে পৌছালো যে, প্রতিবেশী দেশের বাস সার্ভিস নিজ দেশের মতো উন্নত নয়। একটি ক্ষেত্রে নিজ দেশ এগিয়ে আছে এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে পরের ট্রেন ধরার জন্য পুনরায় স্ট্যান্ড থেকে স্টেশনে গেল (২৬ টাকা)। প্রতিবেশী দেশের ট্রেনের বাণিজ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ দেশের তুলনায় দক্ষ হওয়ার কারণে পরবর্তী ট্রেনে ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে জন প্রতি ১৫ টাকা বেশী।

সে যাই হোক অবশেষে দম্পতি পৌছালো "ঝিনুক কোঁটা সাগর বেলায়"। দেরী করে পৌছানোর কারণে দুপুর, বিকেল, গোধুলী, রাত একাকার। অর্থাৎ দ্বিপ্রাহরিক উদ্দাম সমুদ্রস্নান, বৈকালিক ফেসবুকে আপলোডযোগ্য ফটো তোলা এবং রোমান্টিক সূর্যাস্ত দর্শন একত্রিত হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টে বিষয়টি গুরুতর সমস্যা মনে না হলেও বন্ধুপত্নীর তিন পর্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জা করতে না পারার দুঃখে এসিডিটির উদ্রেক হল (এন্টাসিড ২টি ৪ টাকা)। আবার শুধুমাত্র বিকেলের ছবি তোলা পর্বেই হাইরেজলিউশন ক্যামেরা ও মোবাইলের উপস্থিতি বাঞ্চনীয় থাকায় স্নানপর্বে তার নিরাপত্তামূলক (নোনাজলের স্পর্শ থেকে) কোন প্রস্তুতি নেয়া হয় নাই। ফলাফল- চমৎকার কিছু ছবি তোলার পরে তারা যখন সমুদ্রের সাথে (এবং পরস্পরের সাথেও) আন্তরিক ভাববিনিময়ে ব্যস্ত সে সময়ে ক্যামেরা বাবাজির সাময়িক "পটল তোলা"। কিছুক্ষনের মধ্যেই "একই খুরে মাথা কামালো" সাধের মোবাইলটাও। ক্যামেরার শোকে (বিশেষত সদ্যতোলা ছবিগুলো ফেসবুকে আপলোড করতে না পারার শোকে) বন্ধুপত্নী বিমর্ষ (মুডঅন ট্যাবলেট ১০ টাকা, ঘুমের ঔষধ ৫ টাকা) রাতের শেষ পর্বটি বাতিল হওয়ার শোকে বন্ধুবরের কিঞ্চিত এসিডিটি (২ টাকা)। নিষ্ঠুর সমুদ্রদর্শনের আর কোন বাসনা না থাকায় তড়িঘড়ি করে প্রথম ট্রেনেই খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। এরপর সাময়িক (আপাতদৃষ্টে) অক্কাপ্রাপ্ত ক্যামেরা ও মোবাইলের প্রাণরক্ষার্থে চিকিৎসকের (পড়ুন মেকানিকের) কাছে যাওয়া (রিকসা ভাড়া ৫০ টাকা) এবং চিকিৎসকের ফি (ক্যামেরা ১০০০ টাকা, মোবাইল ২৫০ টাকা) পরিশোধের পর "কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিল"। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে থাকার জায়গায় ফিরে আসা (৫০ টাকা)। বন্ধুপত্নী ততক্ষণে "অধিক শোকে পাথর"। বন্ধু সান্তনা দিল দেশে ফেরার পর পরিচিত মেকানিক দেখানো হবে, যার হাতে যাদু আছে বলে পরিচিত মহলে জনশ্রুতি আছে। স্বদেশে ফেরার পর বন্ধুপত্নীর প্রস্তরমূর্তি দেখে মৃত সম্পত্তি দুটোকে নিয়ে অতিদ্রুত বন্ধু পরিচিত মেকানিকের কাছে গেল পুনরুজ্জীবনের আশায় (সিএনজি ভাড়া-৩০০ টাকা)। মেকানিক বললো রেখে যান, দেখবো। বন্ধুবর আশান্বিত হয়ে বাসায় যেয়ে (৩০০ টাকা) পত্নীকে বললো আরে আমাদের দেশের লোকের সাথে প্রতিবেশী দেশের লোকের তুলনা। দেখো এ তোমার ক্যামেরা আর মোবাইল চালু করেই ছাড়বে। সাত কার্যদিবস পরে পুনরায়

আশা নিয়ে মেকানিকের চেম্বারে গমণ (৩০০ টাকা) মেকানিকের বিল পরিশোধ (৫০০+২০০ = ৭০০ টাকা) করে আমার বন্ধু জানতে পারল "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই"। লাশদুটোকে নিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যার্পণ (৩০০ টাকা)।

ইতোমধ্যে ক্যামেরার শোকে এবং কার দোষে এরকম হলো এ নিয়ে তর্কাতর্কির মধ্যে কে কবে কি ভেঙেছে, কথা রাখেনি ইত্যকার নানাবিধ গবেষণায় শুরু হয়েছিল "দুজনার দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যাওয়া।" পারস্পরিক দোষারোপের ফলশ্রুতিতে দুরত্ব ক্রমশঃ বেড়ে "তারারাও যত আলোকবর্ষ দূরে তারও দুরে"। বন্ধুবর তিতিবিরক্ত হয়ে ডিভোর্স ফাইল করল (উকিলের ফি প্রতি ঘন্টায় ২০০০ টাকা)। ৩০০০০ টাকা (উকিলের ফি বাবদ ২০০০০ টাকা এবং নিজের প্রতিষ্ঠানে সময় না দেওয়ায় জরিমানা বাবদ ১০০০০ টাকা) খরচের পর নোটিশ তৈরী হলো। নোটিশ পাওয়া মাত্র বন্ধুপত্নী "নটনড়নচড়ন খটাশ মার্বেল" যাকে বলে দাঁতকপটি (হাসপাতালে যাওয়া আসা ৬০০ টাকা, ডাক্তারের ফি ৪০০ টাকা, টেষ্ট ১০০০০ টাকা)। সুস্থ হয়ে বন্ধুপত্নী বরের থেকে আরো বড় উকিল (বেশী টাকা ফি ঘন্টাপ্রতি ২৫০০ টাকা) দিয়ে নোটিশের জবাব পাঠান (৩০০০০ টাকা)। এরপর মামলা আদালতে এবং সেখানে খরচের ফিরিস্তি দিতে গেলে আদালত অবমাননা হয়ে আমাকে জেলে যেতে হবে বিধায় বাকিটা বিজ্ঞ পাঠকের কল্পনাশক্তির ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

লেখক পরিচিতি
বিসিএস রেলওয়ে প্রকৌশল (যান্ত্রিক)
(২৮ তম বিসিএস)

সায়েন্স ফিকশন গল্প

ক্লিনার

নাসরীন জাহান লিপি

এক.

ব্যাপারটা এখন আর ফ্যাশন নয়।

প্রাচীন কালে বাচ্চাদের যেভাবে পোলিও টিকা খাওয়ানো হ'ত, এখন এটি সেরকমই মনে হয়।

ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ফলে ছোট বাচ্চারাও এখন জানে, মন খারাপ হয়ে যায় এমন যে কোন স্মৃতি মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলতে হয়।

নিয়ম করেই এই কাজটি করেন এখনকার মানুষরা।

নিত্য দিনের রাগ-হতাশা-দুঃখ-বেদনা-অপমান-তিরস্কার-প্রতারণার স্মৃতি জমিয়ে রেখে কি লাভ?

জমতে জমতে মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষকে বোঝাই করে ফেললে এর চাপ তো পড়ে মনের উপর। মেজাজ হয়ে যায় খিটিমিটি। বিষণ্নতা পেয়ে বসে। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

আনন্দের বিষয়, আজকাল কেউ আত্মহত্যা করে না।

মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষকে সময় মতো ক্লিনারের কাছে সঁপে দিলেই হয়। দিব্যি ক্লিন হয়ে যাবে আবোল তাবোল স্মৃতি। বিন্দুমাত্র দাগ পড়বে না মনের উপর।

ফুরফুরে মন নিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়া, জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করার চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে!

দুই.

আমি একজন স্মৃতিকোষ ক্লিনিং এ্যাসিস্টেন্ট। স্মৃতিকোষ ক্লিনার কিভাবে চালাতে হয়, ভাল ভাবেই জানি আমি।

স্মৃতিকোষ ঝেড়ে মুছে ঝরঝরে নতুন করে দেওয়ার কাজটা করতে আমার ভালই লাগে।

শিফটিং ডিউটিও করতে হয়। বলা তো যায় না, কার স্মৃতিকোষ কখন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে আর সাফ সুতরো করার কাজটা খুবই জরুরি হয়ে পড়বে।

দিনে বা রাতে, যখনি ডিউটি থাকুক না কেন, কাজ বলতে গেলে একই রকম। নাম-ঠিকানা টুকে রেখে ক্লায়েন্টের মাথাটাকে স্মৃতিকোষ ক্লিনারের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে হয়। সামনে রাখা মনিটরে ভেসে ওঠে ছবি। ক্লায়েন্টের স্মৃতিগুলো একের পর এক

আসতে থাকে মনিটরের পর্দায়।

রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে জ্বলতে থাকে আলো।

সবুজ আলো জ্বললে বুঝতে পারি, স্মৃতি আনন্দের।

নীল আলো জ্বললে বুঝি, এই স্মৃতি বেদনার।

লাল আলো জ্বললে বুঝতেই পারি, স্মৃতির ঘটনাতে ক্লায়েন্টের প্রতিক্রিয়া ধ্বংসাত্মক।

সরকারের নির্দেশ আছে, যে কোন লাল আলোর স্মৃতি সাথে সাথে মুছে ফেলতে হবে। ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড কিছুতেই ঘটতে দেওয়া যাবে না। যদি কোথাও ওরকম কিছু ঘটে যায়, পুলিশ আজকাল অপরাধীকে ধরার আগে ক্লিনার কোম্পানিগুলোর ডাটা ঘাঁটতে শুরু করে। লাল আলোর ছিটেফোঁটা কোথাও আছে টের পেলে হ'ল। কোম্পানির লাইসেন্স চির দিনের জন্য কেড়ে নেওয়া হবে।

নীল আলোর স্মৃতি মুছতে হয় ক্লায়েন্টের অনুরোধে। নীল আলোর স্মৃতিতে কখনো কখনো শুধু বেদনা নয়, আনন্দের ঘটনাও থাকে। আনন্দ পরবর্তীতে পাল্টে গিয়ে বেদনা জাগিয়ে দেয়।

এই স্মৃতিগুলো মস্তিষ্কের কোষ থেকে মুছে ফেললেও মূল সার্ভারে থাকে, সাথে সাথে মোছা হয় না। তিন দিন সময় দেওয়া হয় ক্লায়েন্টকে। বেদনার কারণ সরে গিয়ে আনন্দময় হয়ে যেতে পারে সব।

তিন দিনের মধ্যে ক্লায়েন্ট যদি স্মৃতি ফিরে পাওয়ার আবেদন না করেন, মূল সার্ভার থেকে স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে হয়।

আমার সাড়ে সাত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসা ক্লায়েন্টের সংখ্যা খুবই কম।

পেছন ফিরে তাকানোর সময় কি আছে আমাদের?

একমাত্র বুড়ো-হাবড়া যারা, তারা মাঝে সাঝে আসে স্মৃতি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।

তিন.

রোজেলা মাখলুস।

বিষণ্ন মুখের তরুণীটি তিন দিন আগে এসেছিল আমারই চেম্বারে।

নাম-ঠিকানা টুকে নেওয়ার সময় আমাকে অবাক করে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটি।

আমি নিয়ম ভেঙ্গে বলেই ফেললাম, আপনি সময় নিন। ভেবে দেখুন, যা করতে চাইছেন তা করবেন কি না।

রোজেলা চোখ মুছে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এত কষ্ট পেয়েছি, আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

সত্যিই তো, বেচারা অনেক কষ্ট পেয়েছে!

একবারও সবুজ আলো জ্বলল না।

নীল আলো সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্বলেই থাকল।

আমি টেম্পোরারি ক্লিনিং বোতামটা চেপে রাখলাম। খুব দ্রুত মনিটরে স্মৃতির ছবিগুলো সরছিল বলে ভাল ভাবে দেখিনি, ওর কষ্টকর স্মৃতিগুলো কেমন ছিল।

স্মৃতি মুছে ফেলার পর ঝকমকে চোখ-মুখ নিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে রোজেলা।

তিন দিনের ভেতর স্মৃতি ফিরে পেতে চাইলে যে ডাটা কার্ডটা জমা দেবে, তা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মন থেকেই বললাম, ভাল থাকবেন।

চার.

কী আশ্চর্য!

রোজেলার ফিরে আসার অপেক্ষায় গত তিন দিন কাটিয়েছি আমি।

রোজেলাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। মেয়েটাকে দেখার আগ্রহেই স্মৃতিভরা ফাইলটা খুলে দেখি।

মনিটরে আবারো ভেসে ওঠে দৃশ্যগুলো।

গতি কমিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে দেখতে বসলাম, কোন্ কষ্টের স্মৃতি রোজেলা মাখলুসকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলছিল!

খরপরাজকে দেখে চমকে উঠলাম। য়্যুনিভার্সিটিতে দুইজন এক সাথেই পড়েছি।

স্মৃতির দৃশ্যগুলো দেখে বুঝলাম, রোজেলার সাথে খরপরাজের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। বিয়ের দিন-তারিখও ঠিক করেছিল দু'জনে।

কাজী অফিসে গিয়েছিল রোজেলা।

খরপরাজকে পায়নি।

খরপরাজ কি যায়নি কাজী অফিসে?

কিন্তু...

খরপরাজ তো আমাকে বলেছিল, ও বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাকে বিয়ে করছে, কবে করছে, অত কিছু ভাল ভাবে শুনতে পারিনি ব্যস্ততার কারণে। কিন্তু খরপরাজের বিয়ের খবরটা তো আমার কাছে ছিল।

তবে কি বিয়েটা হয়নি?

না কি খরপরাজ রোজেলাকে ঝুলিয়ে রেখে আর কারোর গলায় মালা ঝুলিয়েছে!

পাঁচ.

টেলিফোনেই পেয়ে গেলাম খরপরাজকে।

ও রোজেলা নামের কাউকে চিনতে পারল না।

বিয়ে করবে বলে আমাকে কি বলেছিল, তা-ও মনে করতে পারল না। কেবল নাকি তাহিতি নামের এক মেয়ের সাথে ভাব হয়েছে। ভাবটা জমে গেলে না হয় বিয়ের কথা ভাববে।

তাহিতির কথা দারুন উৎসাহে বলতে গেলে ওকে বাধা দিয়ে জানতে চাইলাম, কবে গিয়েছিলি স্মৃতিকোষ ক্লিনারে? মনে না থাকলে দ্যাখ্ তো, তোর নামে কোন ডাটা কার্ড আছে কি না। জানিস্ তো, ডাটা কার্ড ছাড়া স্মৃতি ফিরে পাওয়া মুশকিল। ওটাতে স্মৃতি ক্লিনিং-এর ফাইল নম্বর থাকে।

ছয়.

খরপরাজের ডাটা কার্ড নম্বর দেখে মূল সার্ভার থেকে জেনে গেলাম, তিন দিন আগে খরপরাজ স্মৃতিকোষ ক্লিনারে মাথা পেতে দিয়েছিল। শিফটিং ডিউটি থাকায় আমার সাথে ওর তখন দেখা হয়নি।

মূল সার্ভার থেকে দেখে নিলাম খরপরাজের মুছতে চাওয়া স্মৃতির ফাইল।

যা ভেবেছিলাম, তা-ই।

রোজেলার জন্য কাজি অফিসে গিয়েছিল খরপরাজ।

পায়নি রোজেলাকে। মাত্র তিন মিনিট সাতান্ন সেকেন্ডের জন্য দেখা হয়নি দু'জনের।

যাক্‌গে, ওসব কথা এখন আর বলে কোন লাভ নেই। এই যেমন, তাহিতির কথা বলেও কোন লাভ নেই।

খরপরাজ বলছে, য়্যুনিভার্সিটিতে তাহিতি নাকি আমাদের দুই ক্লাস নিচে পড়ত। আমার সাথে ওর নাকি খুব ভাব ছিল।

বাজে কথা! কৈ, আমার তো তেমন কিছুই মনে পড়ছে না।

এখন আমার মন জুড়ে কেবলি রোজেলা।

রোজেলা মাখলুস।

গুনগুন করে গেয়ে উঠি প্রাচীন কালের ভালবাসাবাসির একটি গান-

এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়....এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না!

লেখক পরিচিতি

সম্পাদক, সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা 'নবারুণ'

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা

২২তম ব্যাচ বিসিএস তথ্য সাধারণ ক্যাডার

নারী আন্দোলন ও নারী দিবসের প্রেক্ষাপট

জিনাত আফরীন

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ উপলব্ধি বাঙালি মুসলিম এবং হিন্দু সমাজে তখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। সৃষ্টি সুখের উল্লাস কেবল পুরুষ সমাজের জন্যই প্রযোজ্য ছিলো। অবশ্য দোষটা শুধু বাঙালি সমাজে চাপিয়ে দিলে অন্যায় হবে। বিশ্ব জুড়েই নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ছিলো পুরুষ নির্ভর। পুরুষের আধিপত্য ও নিরুংকুশ কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নেয়াটা ছিলো নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় নারীর কম মজুরি বিশ্বের সব শিল্পাঞ্চলেই প্রচলিত ছিলো। কম উৎপাদনের অজুহাতে ঘন্টা প্রতি অর্ধেক বেতন পেতো একজন নারী শ্রমিক।

থেরেসা মালকিয়েল (১৮৭৪-১৯৪৯)

বিক্ষিপ্ত নারী-শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় আমেরিকার স্বাধীনতার পরই। বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক স্টেট জুড়ে। তবে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদের ঝড়টা প্রথম শুরু করে সমাজবাদী রাজনীতিবিদেরা। সোস্যালিস্ট পার্টি অব আমেরিকার জাতীয় মহিলা কমিটির প্রধান থেরেসা মালকিয়েল ১৯১০ সালে তাঁর "দ্য শার্টওয়েস্ট স্ট্রাইকার" উপন্যাসে নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর উপন্যাসটি নিউ ইয়র্কসহ সারা আমেরিকার নারী শ্রমিকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর আগের বছর তাঁরই উদ্যোগে সোস্যালিস্ট পার্টি অব আমেরিকা প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী দিবস উদযাপন করে। দিনটি ছিলো ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯০৯। তবে এটি উদযাপিত হয় ৮ মার্চ ১৮৫৭ সালে নিউ ইয়র্কের মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতিবাদ সভার স্মরণে। পরবর্তীতে এ দিনটিই স্বীকৃত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ এ স্বীকৃতি প্রদান করে।

জাতি সংঘের এ স্বীকৃতি এতো সহজে আসেনি। পুঁজিবাদী আমেরিকার সাথে সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের শীতল যুদ্ধের কারণে শ্রমিক দিবসের (মে দিবস) মতো নারী দিবসের স্বীকৃতিও ঝুলে থাকে। ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে

আমেরিকান সোস্যালিস্ট নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জার্মান নারীবাদী কমিউনিস্ট নেত্রী লুইস জিয়েৎস একটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একই প্রস্তাব দ্বিতীয়বারের মতো উত্থাপন করেন আরেক কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন। তাঁদের প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন কেট ডাংকার। তবে প্রস্তাবে নারী দিবস হিসাবে নির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়নি। ১৭টি দেশ থেকে আসা ১০০ জন নারী নেত্রী একমত হন যে এখন থেকে নারী-পুরুষ সমঅধিকার এবং নারীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইউরোপসহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই তখন পর্যন্ত নারীর কোনো ভোটাধিকার ছিলোনা।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯১১ সালের ৮ মার্চ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে উৎসবমুখর পরিবেশে এ দিনটি পালন করা হয়। ভিয়েনার বিখ্যাত রিংস্ট্রাস নামক সার্কুলার সড়কে লক্ষ মহিলার সমাবেশ ঘটে। সেখানে তাঁরা ভোটাধিকার এবং সরকারি অফিসে চাকুরীর দাবিতে স্লোগান দেন। তাঁরা চাকুরী ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য অবসানের জোরালো দাবি জানান। আমেরিকায় নারী দিবস পালনের ক্ষেত্রে আগের নিয়মে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার নির্ধারণ করা হয়। রাশিয়া ১৯১৩ সালে সর্বপ্রথম নারী দিবস পালন করে। আমেরিকার আদলে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ শনিবার তাঁরা দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯১৪ সালে প্রায় সর্বত্রই ৮ মার্চ নারী দিবস পালিত হয়। এর অন্যতম কারণ এটি ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার। এদিন তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম নগরী লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে ইংরেজ রমনীরা। বক্তৃতা দিতে ট্রাফালগার স্কয়ারে যাওয়ার পথে কমিউনিস্ট নেত্রী সিলভিয়া পাংকহার্স্ট পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। ৮ মার্চ, ১৯১৭ রুশ সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী পেত্রোগ্রাদে (পরবর্তীতে লেনিনগ্রাদ এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ) বস্ত্র কারখানার মহিলা শ্রমিকেরা দিনভর আন্দোলন করে। মার্চের এ আন্দোলন জাতীয় রূপ নিয়ে অক্টোবরে বিপ্লবে পরিণত হয়।

সমাজতান্ত্রিক চীনে ১৯২২ সাল থেকে নারী দিবস পালিত হয়। তবে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে গণচীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৮ মার্চ মহিলাদের ছুটির দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। পুরুষ চীনারা অবশ্য এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশ্বের অনেক দেশে এটি সার্বজনীন সরকারি ছুটির দিন। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে নেপাল এবং আফগানিস্তানে ৮ মার্চ সরকারি ছুটির দিন। বাংলাদেশে দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদযাপিত হয়। তবে সরকারি ছুটির দিন নয়। গণসচেতনা বৃদ্ধি ও শ্রমজীবী নারীদের সম্মান দেখিয়ে অন্ততঃ কলকারখানায় কর্মরত নারীদের সবেতনে ছুটির কথা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

দ্রোহের কবি, জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারী সমাজকে জাগাতে গান গেয়েছেন। "জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা। জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।। দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা, নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা, জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী, বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা।।"

নারী জাগবেই। বহ্নি শিখায় জ্বলে ওঠা নারী মানবতার জয়গান গাইবেই।

লেখক পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

ভূত কাহন : স্মৃতি কথা

হুমায়ারা আক্তার

বহুদিন পর পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এবার আমি ঢাকায় গিয়ে বান্ধবী রানুর বাসায় উঠেছি। বাসায় প্রবেশের পর থেকে শুরু হল দু' জনের গল্প; আর তা চলতে থাকল অবিরত ভাবে। কতো বিষয় নিয়ে? কত স্মৃতি নিয়ে? তার হিসেব রাখিনি। গল্পে গল্পে বাদ গেলনা ভূতের ভয় পাওয়ার গল্পগুলো ও --

তখন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আর রোকেয়া হলে আবাসিক থাকি। আমি থাকি মেইন বিল্ডিং -৩২ এ, আর রানু মেইন - ২৯ এ। দু'জনের বাড়ি গোপালগঞ্জ হওয়ায় ছুটিতে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরতাম। একবার ও বলল, এবার আমি ফরিদপুর হয়ে বাড়ি যাব। ফরিদপুর খালাবাড়ি একদিন বেড়িয়ে ওখানে মা আছে মাকে নিয়ে তারপর বাড়ি যাব। খালা ভীষণ ধরেছে, অনেক দিন আমাদের দেখা হয়না তাই ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাকে রানু অনেক পীড়াপীড়ি করতে লাগলো ওর সাথে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। ওখানে নিরাপত্তাজনিত কোন ধরনের সমস্যা হবেনা বরং ভীষণ মজা লাগবে এই নিশ্চয়তাও সে দিল। কোনদিন ফরিদপুর শহর দেখা হয়নি, এই সুযোগ। এ সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে - মনে সায় দিলে তা হাতছাড়া করলাম না। রাজি হয়ে গেলাম। দু'জনে চলে গেলাম ফরিদপুরে। রানুর মা খালারা সাত বোন এক ভাই। রানুর মা আর এক খালা ছাড়া সবাই থাকে ফরিদপুর শহরে। খালাম্মা সবার বাসাতেই আমাকে নিয়ে গেলেন। সবার আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা আজও ভোলার নয়। এরপর খালাম্মা প্রস্তাব রাখলেন গ্রামে তাঁর বাবা-মা আছেন সেখানে একদিন বেড়ানোর জন্য। ওর নানাবাড়ি বোয়ালমারির দূর্গাপুর গ্রামে। বৃদ্ধ বাবা - মাকে খালাম্মার অনেক দিন দেখা হয়না। কিন্তু কেউ যেতে চায়না। পুরনো বড় ফাঁকা বাড়ি - বিদ্যুৎ সুবিধা নেই, ঘরের বাইরে টয়লেট, রাতে বাগানে কেমন শব্দ হয়, গাছপালায় আর শূন্যতায় ঘেরা বাড়িকে মনে হয় একখানা 'ভূতের বাড়ি'। নানাভাই পাকিস্তান আমলে CSP অফিসার ছিলেন। সাত মেয়ে এক ছেলে আত্মীয় স্বজন মিলে এক সময় বেশ রমরমা ছিল বিশাল আয়তনের এই বাড়িটি। এখন বুড়োবুড়ি ছাড়া আর কেউ থাকেনা, তাই কেমন যেন ভৌতিক রূপ নিয়েছে বাড়িটা। এ কারনে ভয়ে নাতি নাতনি, ছেলের বউ কেউ যেতে চায়না। কিন্তু আমার কাছে ওসব কাহিনী তুচ্ছ মনে হল। কারন, শহরে যারা মানুষ তারা গ্রামকে এমনই ভাবে। আমি একেতো গ্রামের মেয়ে, দ্বিতীয়ত- দাদীর কাছে লেখাপড়া গল্পগুজব আর দাদীর পরিচর্যা করে মানুষ, তাই প্রবীণদের প্রতি রয়েছে আমার বিশেষ দরদ ও ভালবাসা। খালাম্মার প্রস্তাব তাই আমি উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলাম। পরদিন ভোরেই আমরা রওনা হলাম দূর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। আমাদের সহযাত্রী হলেন মামা-মামী, একমাত্র মামাতো বোন ও খালাতো বোনেরা। খালাম্মা আর রানুতো আছেই। বর্ষাকাল, ফরিদপুর শহর ছেড়ে যাওয়ার পর যখন গ্রামের

দিকে এগুতে লাগলাম বর্ষায় কাঁচা রাস্তা একেবারে গলেখষে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে থাকলো। সেই সাথে স্লিপ কেটে ফেলে দেয়ার তামাসাও কম করছিলনা। যাই হোক, কাঁদা আর পিচ্ছিল আকাঁ বাকাঁ সরু পথে পা টিপে টিপে - সেই সাথে গল্প, কষ্ট আর ক্ষুধা মিশ্রিত সময় অতিবাহন শেষে পৌছালাম আমরা সাধের দূর্গাপুরে। শতবর্ষোত্তীর্ন নানা-নানিকে দেখে সালাম নিবেদন কালে দেখলাম, এত বয়স হলেও তারা বেশ সুস্থ টনটনেই আছেন বটে। নানার হাতে তসবি আছে। আর নানী গৃহস্থালীর টুকিটাকি কাজ করছেন। তবে তিনি নানা অপেক্ষা একটু নরম আছেন। ফ্লোর পাকা বিশাল এক টিনের ঘর, এছাড়া আছে একটি রান্নাঘর, একটি কাচারী ঘর, একটি লেপ তোষক রাখার ঘর, একটি জ্বালানি কাঠ রাখার ঘর আর গাছগাছালি দিয়ে ঠাসা একখন্ড নিঃসর্গ প্রকৃতির হাতছানি। যাই হোক, আমাদের সামনে পিঠা, মুড়ি, গুড় দেয়া হল। ক্ষুধায় আমরা গব গব করে খেয়ে নিলাম। এরপর একটু রেস্ট নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে বাড়িটা ঘুরে দেখছিলাম। রানু বারবার এ বাড়িতে ভূতের ভয়ের কথা বলছিল। আমি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। তাই দেখে সবার সাহস হচ্ছিল। আসলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিলনা। রানুর ভাল লাগার আর শৈশবের স্মৃতি মধুর জায়গাগুলো আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। খালাম্মা আর মামী লেগে গিয়েছিলেন রান্নাবান্নায়। আমরা পুকুরে হই হল্লা আর সাঁতার কেটে গোসল সেরে আবারও গল্পের আসর জমাতে শুরু করলাম। ঘুরেফিরে গল্পের বিষয় আবারও এবাড়ির ভৌতিক কাহিনী - যা আমার অসহ্য আর বানোয়াট লাগায় আমি ক্ষেপে যাচ্ছিলাম। প্রকৃতির দক্ষ হাতের তুলি দিয়ে সবটুকু দরদ আর আবেগের রঙের মিশ্রনে আঁকা অপরুপ এ বাড়িটিকে ঘিরে অত কুৎসা সহ্য না হওয়ায় আমি রানুর ওপর ক্ষেপে উঠে বললাম, ঘোড়ার ডিম আছে এ বাড়িতে। এরপর খাবার এল, খাবার খাওয়ার সময় নানি আমাদের বললেন, নানারা একটু সাবধানে থেক। একটু দোষ আছে। নানা বললেন, না কিসের আবার দোষ? ভয় নাই। আমি তাই পাত্তা দিলাম না। এরপর খাবার সেরে আমরা শুয়ে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম, তখন খালাম্মা বললেন, আমারও তোমার মত ভয় লাগত না। নানাজনে নানা কথা বললে আমি তা উড়িয়ে দিতাম। গত কয়েক মাস আগে আমি যখন বাবা মায়ের কাছে আসছিলাম, তখন একদিন আসরের নামাজ আদায় কালে দেখি আমার জায়নামাজের সামনে কালো নাদুস - নুদুস হামাগুড়ি দিতে জানা বয়সের একটি আকর্ষনীয় বাচ্চা বসে আছে। এই নির্জন বাড়িতে এ বাচ্চা কার তাকে কোলে তোলার জন্য আমি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করতেই দেখি বাচ্চাটি সেজদা বরাবর হামাগুড়ি দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে টিনের বেড়ার দিকে, আমি আগাতে থাকলাম দেখি সে নেই। পরক্ষনেই আমার মনে হল, এই দিকেতো দরজা নেই তবে বাচ্চা গেল কই? তাছাড়া এই নির্জন বাড়িতে বাচ্চা আসবে কৈ থেকে। আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয়ে আমি যে কয়দিন থাকার ইচ্ছে ছিল তা না থেকে চলে এলাম। এরপর আর আসিনি। এ ঘটনা শুনে আমার কিছুটা ভয় লাগতে শুরু করল। প্রকৃত পক্ষে ছোট বেলা থেকেই আমি খুবই ভিতু টাইপের। বিশেষ করে ভূতের আর অন্ধকারের ভীষণ ভয় আমার। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে নামতে শুরু করল, বাগানে গাছ গাছালিতে শব্দ হতে থাকলো

আর ভেতরে ভেতরে ভয় আমার বাড়তে লাগলো। রাত যত বাড়ছিল বাগানের মধ্যে হল্লা তত বাড়ছিল। কখনও মনে হচ্ছিল অনেকে ডাল ধরে ঝাকুনী দিচ্ছে আবার কখনও মনে হচ্ছিল বাগানের মধ্যে ফুটবল খেলার আসর জমেছে। বাশির বাজনা আর জনতার গম গম শব্দ নানা ধরনের শব্দ হচ্ছিল। এক এক জনের টয়লেট পেলে আমরা সবাই মানব বন্ধন করে মানব শিকল ধরে এক এক জন করে টয়লেটে যাই। আমি দাড়িয়ে থাকি টয়লেটের পাশেই বাগানের কাছে। আর বরাবরের মত অভয় দিতে থাকি। বলতে থাকি বাগানে এক ধরনের প্রাণী আছে যারা ডাব খায়, বিভিন্ন ফল খায় আমরা তাদের বলি 'গলুয়া'। এই গলুয়া বা বড় বিড়াল টাইপের প্রাণীটি গাছে গাছে লাফিয়ে চলে আবার পাতায় পাতায় চড়ে দ্রুত চলে তখন ভীষণ শব্দ হয়। আবার এরা যখন একগাদা পেসাব করে তখন মনে হয়, ভুতে বা জ্বীনে.....। এসব বলে বলে সবাইকে নির্ভীক করার চেষ্টা করছিলাম আর গাছগাছালির দিকে তাকাচ্ছিলাম। টয়লেট থেকে দূরে একটা আম গাছ ছিল। তার ছোট একটি সরু ও ছোট শাখা টয়লেটের পাশ দিয়ে উঠোনের দিকে প্রসারিত ছিল। হঠাৎ দেখি ওই শাখার আগা থেকে কলসির মত করে প্রায় একবালতি পানি পড়ল আমাদের সামনে। সবাই আবার ভয় পেয়ে দৌড়ে পালালাম। আমি আবারও গলুয়ার কথা বলে অভয় দিলাম; কিন্তু নিজের মনে রয়ে গেল বিশাল এক প্রশ্ন? আমিতো তাকিয়ে ছিলাম গলুয়া তো দেখলাম না, তবে কিভাবে এল এত পানি। তাও আবার আমাদের একেবারে সামনেই। কোন শব্দও হোলনা বা কেউই গলুয়াকে দেখলোনা। ভয় নিয়ে ঘরে জল্পনা কল্পনা চলছিল। এর মাঝেই আমরা রাতের খাবার খেতে বসলাম আর বাহারী আলাপ আলোচনায় সবাই মুখরিত থাকলাম। এবার শোবার পালা। সবাই চায় আমার পাশে শুতে এমনকি মামীও। অবশেষে দুটো খাট এক করে বিশাল এক বিছানা তৈরী করা হল। সিদ্ধান্ত হল আমি এক পাশে থাকবো আর অন্য পাশে থাকবেন খালাম্মা। মাঝখানে রাণু আর মাঝে দিয়ে সব পিচ্চিরা। আমাদের সাথে লাগোয়া আর এক খাটে মামা - মামী। আমাদের মাথা বরাবর একটা হারিকেন ফুল জ্বালিয়ে রাখা হল আর মামির খাটের পাশে আর একটি হারিকেন ফুল জ্বালিয়ে রাখা হল। এরপর আমরা সকলে মিলে শুয়ে শুয়ে দোয়া দরুদ পাঠ শুরু করলাম - যার স্টকে যা ছিল। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু এত আলোতে আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিছুটা ভয় আর তীব্র আলোয় স্তব্ধ রাতে আমার সঙ্গি ছিল কেবল অসহায়ত্ব। রাত তখন গভীর, আনুমানিক ২ টা/৩ টা বাজতে পারে। আমার ডান বাহুর ওপর মাথা রেখে মামাতো বোন নাদিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে আর আমি বা হাতে তাকে আগলে ধরে চোখ বন্ধ করে আছি। এমন সময় আমার কপালের ওপর একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করতেই আমি চোখ মেললাম। দেখি, সাদা রঙের শিপন শাড়ি পরিহীতা এক অপ্সরা। সেও নাদিয়া ঘাড়ের ওপর দিয়ে এক হাত রেখে অন্যহাত আমার কপালের ওপর রেখে কিছুটা উপুড় হয়ে আমাকে অপলক ভাবে দেখছে। ওর শুভ্র পাখনা দুটি দু'দিকে প্রসারিত ছিল। বুকের বা'পাশে ছড়িয়ে রাখা রেশমী দীঘল কালো এলো চুল আর শুভ্র পাখনা হারিকেনের আলোয় চিক চিক করে অন্যরকম সৌন্দর্য ছড়াচ্ছিল। সাথে সাথে আমার

সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে হিম শিতল রক্ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি পাথর হয়ে যাচ্ছিলাম। ভেতর থেকে চিৎকারের অনুভূতি আসছিল কিন্তু আমি তাকে গলার মধ্যে আটকে রেখেছিলাম। কারন আমি চিৎকার করলে ওই রাতে ওই খাটের সবাই প্রচন্ড ভয় পেয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারতো। তাই একাকী লড়ছিলাম। আমি কেবল নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম আমি যা দেখছি সত্য দেখছি কি - না। আমার কোলের মধ্যের নাদিয়া আসল না ওই অপ্সরার কোলের কাছের নাদিয়া আসল। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি নাদিয়াকে ডাকতে থাকলাম আমার কোলের মধ্যের নাদিয়া সাড়া দিল। অতঃপর আমি নিশ্চিত হলাম আমার কাছের নাদিয়াই আসল নাদিয়া। অপ্সরাকে নিখুঁত, মায়াবী, সুন্দরী লাগছিল। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু শুনেছি পেতনীরা ঘাড় মটকায় আর আমিতো ওদের তাচ্ছিল্লো করছিলাম। যদি ওরা তার প্রতিশোধ নেয়? আমি কী করব? এ তো সরছে না। অতঃপর মাথায় এল সূরা ইয়াসিন পড়ার। ইয়াসিন সূরার মাহাত্ব আমি নিজ চোখে দেখেছি। আমাদের বাগানে আকরাম কাক্কুকে জ্বীনে বেধে রেখে গেলে সে কেবল কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তাকে যখন স্পর্শ করা হল অমনি অজ্ঞান হয়ে গেল। বাড়ি আনার পরও সে অচেতন ছিল। এরপর যখন তার গায়ে ইয়াসিন সূরা পড়া পানি ছিটানো হল, তখন তার জ্ঞান ফিরে এল এবং এতক্ষনের সমস্ত ঘটনা তার অজানা বলে প্রতীয়মান হল। এরকম আর একটি কেসও আমি দেখেছি। যাই হোক, আমি সূরা ইয়াসিন পাঠ শুরু করলাম জোরে জোরে। অপ্সরা আমার মাথা থেকে হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে আমার বা' পাশ দিয়ে আমাকে ঘেষে ঘেষে পায়ের দিকে টিনের বেড়ার দিকে যাচ্ছিল; যেদিকে কোন দরজা নেই। এরপর মিলিয়ে গেল। আমি ভয়ে কেবল প্রহর গুনছিলাম কখন সকাল হবে? কখন সকাল হবে??? সারাটা রাত একা একা মৌনভাবে যুদ্ধ করতে করতে আমি ভীষন ক্লান্ত ছিলাম। ভোরে সবাই ঘুম থেকে উঠলে নানুর ফজরের নামাজ শেষ হলে আমি নানুকে বললাম রাতের কাহিনী আর এর মাধ্যমে রাষ্ট্র হয়ে গেল আমি ভূতের ভয় পেয়েছি। তখন নানা ও জায়নামাযে ছিলেন, তিনি আমাকে ডাকলেন দোয়া পড়ে আমাকে ফুঁক দিয়ে দিবেন, যাতে ভয় পেয়ে আমার কোন ক্ষতি না হয়। ঝাড়ার সময় তিনি আমাকে বললেন সত্যিই একটু দোষ আছে তবে তোমার কোন ক্ষতি করবেনা। ওদের সাথে আমার কথা হয়। ওদেরকে আমলে নেয়নি তাই একটু ভয় দেখালো। যাই হোক, লোমহর্ষক স্মৃতি নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। এরপর নিরিবিলি এক সময়ে দাদুর কাছে সব খুলে বললাম। দাদু আমাকে আবারও পানি পড়া খাওয়ালেন। ছুটি কাটিয়ে দুই/তিন দিন থাকতে আমি ফিরে এলাম ইউনিভার্সিটিতে আমার কিছু নোট করার বাকি ছিল তা মেকআপ করার জন্য। এসে দেখি, কোন ছাত্রী হলে নেই বা কেউ ফেরেনি। দু'একজন থাকলেও আমার চোখে পড়ছেনা। আমি যে ভবনে থাকি তা বিশাল দৈর্ঘ্যের। বৃটিশ আমলের তৈরি পাঁচ তলা ভবন। প্রতি রুমের দুই পাশ দিয়ে প্রশস্ত বারান্দা। অর্থাৎ প্রতি ফ্লোর রাউন্ড দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত বারান্দা দ্বারা। প্রতিরুমে সংযুক্ত টয়লেট, গোসলখানা আর যে কয়টি বেড সে কয়টি লকার। দরজা দুটো বাতাস চলাচলের উপযোগী করে তৈরি। আর মাথার ওপরে ডাবল ছাদ। যাতে এক ফ্লোরের

শব্দ অন্য ফ্লোরে না যায়। রুমের ভেতরে সিলিংএ চৌকো করে কাঁটা আর তার মুখে বিশেষভাবে ঢাকনা দেয়া - যাতে রুমের ভেতরের পড়াশুনার শব্দের প্রতিধ্বনি যাতে না হয়। সে যাই হোক, বিশাল পাঁচতলা ভবনে আমি একা। শুনেছি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু মেয়ে এ ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহুতি দিয়েছিলো তাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে। আবার অনেকে পাকিস্তানী সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শাহাদাৎ বরণ করতে হয়েছিল অনেককে। সেই থেকে এ ভবনে অতৃপ্ত আত্মারা সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি মারে বলে কথিত আছে। যতসব কু কথা মনের মাঝে ভীড় জমাচ্ছিল। রুমের গোজগাজ সেরে গোসল সেরে একটা ঘুম দিলাম আর উঠলাম গিয়ে সন্ধ্যায়। মাগরিবের নামাজ পড়ে পড়তে বসলাম। বেশ রাত হলে কে যেন দরজায় টকটক করছিল। কেউ নেই তবে কে টকটক করে। খুলে দেখি কেউ নেই। ফিরে এসে পুনরায় পড়ায় মনোযোগ দিয়েছি আবারও শব্দ। গিয়ে দেখি এবারও কেউ নেই। ভাবলাম মনের শব্দ। খানিকক্ষন পর আবারও শব্দ। এবার ভাবছি খুলবো -ই- না। কিন্তু কড়া নাড়ার শব্দ থামছেই না। বেশ কিছুক্ষন পরে বাধ্য হয়ে খুললাম। দেখি হলের দাদু। বলেন, আপা এতক্ষন ধরে কড়া নাড়ছি আপনি খুলছেনইনা। আমি বললাম, দাদু ভয়ে। দাদু বলল কিসের ভয়। দাদু আমার খোঁজ খবর নিয়ে চলে গেলেন। পড়াশুনা শেষ করে লাইট জ্বালিয়েই শুয়ে পড়লাম রাত ১২ টার দিকে। অনেক রাতে আবার ও কড়ানাড়ার শব্দ। ভয়ে খুলছিনা। শব্দ হতেই আছে। এত ভয় নিয়ে কী বেঁচে থাকা যায়। মানুষ সেরা জীব ভেবে মনে সাহস নিয়ে ভয়ে ভয়ে দরজা খুললাম। দেখি কেউ নেই। আবার শুয়ে পড়লাম। এভাবে গভীর রাতে তিনবার ঘটল। এবার দেখি দরজা খুলে দরজার কাছে দাড়ানো সেই অপ্সরা নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরে সেই একই ভাবে দাড়িয়ে আছে। ভয়ে আমি সোজা শক্ত হয়ে শুয়ে থাকলাম। এবার দেখি সিলিং এর চৌকোর মধ্যে সেই অপ্সরা ও নাদিয়া আবারও দরজায় শব্দ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত ৩টা। এবার আমি উঠে বসলাম। হয় জয় নয়তো ক্ষয়। আয়তাল কুরছি পড়ে বুকে ফু নিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। সত্যিই দেখি দরজা খোলা। আমি গর্জে উঠলাম। কে এত রাতে কড়া নাড়ে? পাশের এক্সটেনশন ভবনের এক মেয়ে জানালা দিয়ে বলল, আমিও শুনেছি। বারান্দায় বেরিয়ে চিৎকার করলাম কার এত সাহস আছে সামনে আয় দেখি। আমি ভয়কে বারবার আহবান জানালাম মুখোমুখি হওয়ার জন্য। এরপর প্রায় ২০০ ফুট বা তার সামান্য কমবেশী দৈর্ঘ্যের মেইন বিল্ডিং চতুর্দিকে ঘুরে তারপর রুমে ঢুকলাম। মনে হল আমি অন্ধকারকে জয় করেছি, আমি ভূতের ভয়কে জয় করেছি। এরপর থেকে আর কোনদিন আমি ভূতের ভয় পাইনি।

লুকায়িত অর্থনীতি দৃশ্যমান হবে কি?

ড. আলেয়া পারভীন

অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান অপরিসীম। গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রেতো বটেই, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে। একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ১৬-২০ ঘন্টা কাজ করা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে তার অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না। কারন চলতি ধারণায় পুরুষ বিবেচিত হয় মূলত শ্রমশক্তিরূপে, যে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তার সেই শ্রমশক্তি বিক্রি করে আয়-উপার্জন করে। আর জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বাকি সব কাজ অর্থাৎ গৃহস্থালী বা সাংসারিক কর্মকান্ডের বোঝা বহন করে সমাজের অর্ধেক অংশ নারীরা, যার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই বিধায় তা স্বীকৃতিহীন অদৃশ্য অবদান। ঘরের কাজ বা গৃহশ্রমকে তাই জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অথচ ক্রমশ বিশ্ব জুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান অবদান ও ভূমিকা এই গার্হস্থ্য কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমের 'লুকায়িত অর্থনীতি' (hidden economy) কে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়েছে যে কী করে জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই 'লুকায়িত অর্থনীতির' উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। নারীর স্বীকৃতিহীন, মজুরীবিহীন সাংসারিক কাজকর্ম আজ তাই অন্ধকার গৃহকোণ থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ঠাঁই পাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাপ (System of National Account SNA) সমাজে নারীর অদৃশ্য অবদানের (Invisible Contribution) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। এই হিসেব থেকে দেখা গেছে যে, পরিবারে তৈরি হয়ে পরিবারেরই ভোগ হয় এরকম জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় মোট ১৬ ট্রিলিয়ন (১৬ লক্ষ কোটি) ডলার মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১১ ট্রিলিয়ন (১১ লক্ষ কোটি) ডলার উৎপাদন করে নারীরা। অন্যভাবে বললে বিশ্বের মোট উৎপাদিত পণ্যের (GDP) ১০-৩৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় মেয়েদের গৃহকর্ম থেকে (যার জন্য তারা আলাদা কোনো দাম পায় না)। এই হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে প্রতি বছর ১৬ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যাচ্ছে বা গণনা করা হচ্ছে না। এর মধ্যে রয়েছে নারী-পুরুষের বিনা মজুরী বা পারিশ্রমিকহীন কাজের মূল্য এবং বিদ্যমান মূল্যে বাজারে নারীদের স্বল্প মজুরির কাজ। যেহেতু এই ১৬ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে নারীর অবদান ১১ ট্রিলিয়ন, তাই বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীর অদৃশ্য অবদান হলো ১১ ট্রিলিয়ন ডলার। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, মেয়েরা সংসারে যে কাজ করে, তার দাম দিতে হলে এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করলে সমস্ত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। স্যালারি ডট কম নামে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের একটি গবেষণায় দেখান যে, মায়েরা পারিশ্রমিকবিহীন যে সকল

কাজ করেন সেগুলোকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করতে হলে প্রত্যেক মাকে গড়ে মাকে ১,৩৪,১২১ ডলারের সমপরিমান বেতন দিতে হতো।[১] শামীম হামিদ'র গবেষণা প্রতিবেদন Why Women Count (১৯৯৬)- এ দেখান যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যেক নারী তার পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বার্ষিক গড়ে ৪৭৬৫ টাকা (১৩৩.১৪ ডলার) পরিমান অবদান রাখছেন। তিনি আরো দেখান যে, যদি জাতীয় আয়ের সাথে নারীদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের অবদান যোগ করা হয় তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান ২৫% থেকে বৃদ্ধি পাবে ৪১% পর্যন্ত। আর পুরুষদের অবদান ৭৫% থেকে কমে দাড়াবে ৫৯%।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের পুরুষের চাইতে নারীরা বেশি কাজ (মজুরি ও মজুরিহীন) করলেও অর্থনৈতিক প্রাপ্তিতে নারীর হিস্যা অনেক কম। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হলে পুরুষরাই মূলত আয় উপার্জন করে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হতো।[২] পুরুষের তুলনায় বেশী কাজ করলেও নারী বিশ্রাম বা বিনোদনও কম পান। অ্যাকশন এইড ও ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেন্ডার অ্যান্ড সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (সিজিএসটি)-এর এক গবেষণায় দেখা যায় গবেষণার আওতায় আসা দুটি জেলায় নারীরা গড়ে প্রতিদিন ছয় ঘন্টা সেবামূলক কাজে এবং পাঁচ ঘন্টা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করেন। সেই জায়গায় পুরুষ গড়ে এক ঘন্টা সেবামূলক ও সাত ঘন্টা উৎপাদনমূলক কাজে ব্যয় করে থাকেন। এই হিসাবে নারীরা বিশ্রাম কম পান। নারীর সেবামূলক কাজের কোনো মূল্যায়ন হয়না; অনেকে সেবামূলক কাজকে কাজ বলে স্বীকৃতিও দিতে চান না। গবেষণাটিতে সেবামূলক কাজ বলতে বোঝানো হয়েছে রান্নাবান্না, গৃহস্থালির কাজ ও পরিবারের সদস্যদের যত্ন করা এবং উৎপাদনমূলক কাজ বলতে বোঝানো হয়েছে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালনসহ আয় হয় এমন কাজ। অনুৎপাদনশীল কাজের মধ্যে পড়েছে অবসর, নিজের যত্ন নেওয়া এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গবেষক শামসুল আলম বলেন, অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে নারীরা বিনা পয়সায় যে সেবামূলক কাজ করেন, বৈশ্বিক আয়ে তার অবদান ৫০ শতাংশের বেশী। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, সংসারে সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি মিললে তা মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটায়। নারীদের ওপর সেবামূলক কাজের চাপ কমাতে জীবনযাপন পদ্ধতি সহজ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। একশন এইডের বাংলাদেশের ফারাহ কবীর বলেন, একদিনের জন্য নারীরা কাজ বন্ধ রাখলে জীবনব্যবস্থায় ধ্বস নামবে। সেবামূলক কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়া নারীর উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত হওয়া কঠিন বলে মন্তব্য করেন বাংলাদেশ উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নাসরিন আউয়াল।[৩] পুরুষকে সেবামূলক তথা গৃহস্থালী কাজের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে নারীর অদৃশ্য কাজের ভার কমে

যেত। পাশাপাশি পুরুষের মানবিক হয়ে উঠবে বর্তমানের তুলনায় আরো বেশী মাত্রায়।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ তে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কাজেই লুকায়িত অর্থনীতি বা নারীর অদৃশ্য শ্রমকে দৃশ্যমান করতে সকলকে সচেতন হতে হবে। ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ও হেলথব্রিজ এর এক গবেষণায় দেখা গেছে নারীর কাজ যে গুরুত্বপূর্ণ তা ৮৪.৪% পুরুষই মনে করেন। নারীদের গৃহস্থালী কাজকে অন্যান্য পেশাগত কাজের মতই বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে নগদ অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি গৃহস্থালী কাজকে সমান গুরুত্ব দিলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান আরো উন্নত হতো। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পুরুষের জন্য গৃহস্থালী কাজকে বাধ্যতামূলক করেছে। এসব উদাহরণ আমাদের দেশের প্রয়োগ করা যেতে পারে।[৪] মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট তারানা হালিম বলেন, গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান স্বীকার করার সময় এসেছে।[৫]

প্রকৃতপক্ষে এখনকার নারীরা পুরুষের পাশাপাশি ঘরে-বাইরে ব্যাপক শ্রমদান করছে। এর ফলে অতিরিক্ত কাজের চাপ সমন্বয় করতে নারীরা হিমশিম খাচ্ছে। এমতাবস্থায় গৃহস্থালী কাজে নারীকে পুরুষের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা যেমন আবশ্যক হয়ে পড়েছে তেমনি সাম্যের সমাজ গড়তে নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নও অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। আর নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নই পারে সাম্যের সমাজ গড়তে এবং লুকায়িত অর্থনীতিকে দৃশ্যমান করতে।

সূত্র:

[১] www.salary.com

[২] উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৪র্থ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ-৭।

[৩] দৈনিক প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০১৫।

[৪] খুশি কবীর, গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ ও হেলথব্রিজ, ২০১৩, ঢাকা, পৃ-১১ ।

[৫] প্রাগুক্ত।

লেখক পরিচিতি

সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা

বাংলাদেশ ও নারী

ফাতেমা ইয়াসমীন তনুজা

১৭৫৭ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দুইশত বছরের অধিককাল সময়ে একের পর এক দু:খের দিন পেরিয়ে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। সুদীর্ঘকালের এ সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও পিছিয়ে ছিল না। অথচ এখনও ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, বাল্যবিয়ে, অশিক্ষা, দারিদ্র্যতা, নিরাপত্তার অভাব, যৌতুক, নির্যাতন, চাওয়া-পাওয়ার বঞ্চনা ইত্যাদি কারণে নারীদের প্রকৃত সম্মান, মর্যাদা আজও সমাজে নিশ্চিত হয়নি। সঙ্গতকারণে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে বিশিষ্ট নারীর মূল্যায়ণসহ বর্তমানে নারীর প্রতিবন্ধকতার উপর আলোকপাত করা আমার এ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান :

বাংলার সমাজ উন্নয়নে নারীরা অবদান রেখে গেছেন। আদিযুগ পেরিয়ে সভ্যতার উত্তরণের একটি পর্যায়ে বিশ্বে চরমভাবে অগোছালো সমাজব্যবস্থা, হিংস্রতা, জোর জবরদস্তি, সমাজে উচুশ্রেণির নীচু শ্রেণি উপর নির্যাতন, বর্বরতা, অজ্ঞতা, নারীদের সাথে চরম অমানবিক আচরণ ও লাঞ্চনা-গঞ্জনাসহ তাদের দু:সহ ও যন্ত্রণার জীবন ইত্যাদি ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছিল। বিশেষত: দারিদ্রের তীব্রতায় কন্যা শিশুর খাবার সংগ্রহ করতে না পারা, যুদ্ধকালীন সময়ে কন্যা সন্তান নিগৃহিত হবে এ ভয়ে কন্যা শিশুদেরকে প্রাচীন বিশ্বে সমাধিস্থ করা হতো। ভারত, বাংলায় কন্যা শিশু হত্যা প্রচলন ছিল। ১৮৭০ সালে অভিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ সরকার মেয়ে শিশু হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

সে সময়ের কঠোর পর্দাপ্রথা, প্রসূতি মৃত্যু, অস্বাস্থ্যহীনতা, মূর্খতা সমাজ হতে দূর করতে সর্বপ্রথমে এগিয়ে আসেন পূর্ববঙ্গের শাহাজাদপুরের লতিফুন্নেসা (জন্ম ১৮৭৭)। তিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী যিনি ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট মেডিসিন ও সার্জারী কোর্স নিয়ে মেডিকেল শাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। তিনি মাসিক ৭৮ টাকা করে বৃত্তি পেতেন।

এ যুগের আরেকজন মহান চিকিৎসক ছিলেন কাদম্বরী দেবী যিনি সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে যান। তিনি মহিয়সী নারী লতিফুন্নেসার প্রায় সমসাময়িক চিকিৎসক ছিলেন। কাদম্বরী দেবীর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তিনি ১৮৮৮ সালে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন।

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী সমাজসেবক ছিলেন কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লার লাকসামে প্রতিষ্ঠিত বর্তমানের নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ তারই নির্মিত। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নারী শিক্ষায় নবযুগ উন্মোচন

করেছিল। এমনকি তিনি ১৮৯৩ সালে কুমিল্লার দুঃস্থ পল্লীতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন যা কুমিল্লা সদর হাসপাতালের বর্তমান ফিমেল ওয়ার্ড।

খুলনা বিভাগের তেঁতুলিয়ার জমিদার হামিদুল্লাহ খানের স্ত্রী আজিজুন্নেসা খাতুন ছিলেন এমন একজন নারী যার লেখা সর্বপ্রথম বাংলাদেশী নারী হিসেবে পত্রিকার পাতায় মুদ্রিত হয়। তাঁর কবিতার নাম ছিল হামাদ। আর পত্রিকাটি ছিল নবনুর পত্রিকা। এই পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ সপ্তম-অষ্টম সংখ্যায় তাঁর এ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৯০০ সালের দিকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সিরাজগঞ্জের প্রখ্যাত ব্যক্তি মুন্সি মেহেরুল্লাহর কন্যা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী খায়রুন্নেসা (১৮৭০-১৯১২) তার লিখিত 'পতির পতিভক্তি' শীর্ষক গ্রন্থে নারী সমাজের দুর্গতি তুলে ধরেন। তিনি বলে গেছেন, "স্ত্রীলোকের হীনবস্থাই সমাজের অধ:পতনের মূল কারণ।" তিনি একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। সমাজে নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম।

নদীয়া জেলা গ্যাজেটিয়ারে জে. এইচ. গ্যারেট প্রদত্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৮৭১-৭২ সনে এ জেলায় নারী শিক্ষার জন্য ২১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ১৮৯৮-৯৯ সনে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১০৩ এবং ১৯০৩ সনে তা দাড়ায় ১৫২টিতে। ১৯০৮-১৯০৯ সালে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৭৫ থেকে ৪৭৫৩ তে উন্নীত হয়। এ সময়ে নদীয়া জেলায় ২২৬২ টি বিদ্যালয় ছিল। এ জেলার কুচ্ছি শহরে বাবু রামলাল সাহা তাঁর মাতার নামে চারুলতা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যা বর্তমানে কুচ্ছি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়।

বাংলার নারীসমাজের জন্য জোরালো অবদান রেখেছিলেন রংপুরের বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি সমাজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করবো। আবশ্যক হলে আমরা লেডী কেরানী হতে আরম্ভ করে লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, জজ সবই হইব। উপার্জন করিব না কেন?" এজন্য বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

ময়মনসিংহের ফজিলাতুন্নেসা জোহা ১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ প্রথম বাংলাদেশের মেয়ে। তিনি নারীকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করে গেছেন। তাঁর মতে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পর্দার নামে যে অবরোধ প্রথা চলছে সেটা নারীর হত্যার জন্যে সব অস্ত্রের সেরা অস্ত্র। ঐ অস্ত্রটি নারীর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অবস্থা বিশেষে জীবিকার্জনেও অন্তরায়। অবরোধ ও শিক্ষাহীনতা নারীকে মৃত্যু পথে যাত্রী করেছে।

নারী শিক্ষার হার :

এতসব প্রচেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র আরও বিদ্যালয় নির্মিত হয়। ইডেন স্কুলসহ ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন বাংলায় ৩০৩১টি স্কুল নির্মিত হয় দুই বাংলা মিলে।

তন্মধ্যে ঢাকা জেলায় ছিল ১২৩৩ টি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২,০১,৩৭৭ জন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা পিছিয়ে পড়ে বাল্যবিবাহের কারণে। অন্যান্য ধর্মের নারীরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর ছিল।

রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান :

পশ্চিম বাংলার ন্যায় পূর্ব বাংলার নারীরাও ঔপনিবেশিক শাসন হতে মুক্তি পেতে এগিয়ে আসেন। এ সংগ্রাম ছিল নিজ অধিকার ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার এক রক্তক্ষয়ী ও দুর্বার আন্দোলন। বিলাতী সামগ্রী বর্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলার বিক্রমপুরের তেওতা, ফেঙ্গনাসার, কামারপাড়া, মানিকগঞ্জ এ নারীরা বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়। বায়রার নেতৃত্ব দেন সুশীলাসুন্দরী গুপ্তা।

১৯১৬ সালে চব্বিশ পরগণার পিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হোসনে আরা বেগম। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বৃটিশ শাসক কর্তৃক গ্রেফতারকৃত প্রথম বাঙালী মুসলিম নারী। তাঁর পিতার নাম ছিল মুন্সি মোহাম্মদ এবাদাতুল্লাহ আর চাচা ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামের পটিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। আর মাতার নাম ছিল প্রতিভা দেবী। চট্টগ্রাম ও ঢাকার পাঠ শেষে প্রীতিলতা কলকাতার বেথুন কলেজ হতে ফিলোসফিতে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করেন। তিনি নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে শিক্ষকতার পেশা নেন। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। তিনি বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের দলে যোগদান করে ব্রিটিশ উৎখাতের আন্দোলনে শক্তি বৃদ্ধি করেন। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সময় গ্রেফতার এড়াতে আত্মপ্রত্যয়ী প্রীতিলতা পটাসিয়াম সায়ানাইড পান করে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান। এ রাষ্ট্রের অংশ ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। পাকিস্তানের প্রথম এগার বছরের সিভিল শাসন ও পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসন বাঙালী জাতিসত্ত্বা বিকাশে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। বড় শিল্প বলতে তখন কিছুই ছিল না পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানে ৬০ জন ব্রিটিশ তখনও আমলা হিসেবে নিযুক্ত ছিল। আর প্রশাসনিক পদ বলতে এদেশীয়রা কিছু কেরানী পদে নিযুক্ত ছিল। ১৯৬৯ সালের এক হিসাবে পাকিস্তানের ৪১ জন প্রশাসনিক আমলার মধ্যে সকলেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। এ চরম বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারী:

বাংলাদেশের মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠী হতে সাংস্কৃতিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে বেশী। সর্বপ্রথমে আসে ভাষার উপর আঘাত। মাতৃভাষা বাংলার মহান

ভাষা আন্দোলনে সিলেটের জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা নাজিবুন্নেসা, রাবেয়া খাতুন, ঢাকার রওশন আরা বাচ্চু, জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ প্রমুখ অংশ গ্রহণ করেন। দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিশেষত: মাতৃভাষার জন্য এভাবে লড়াই আর কোথাও হয়নি। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত করে।

এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের নারীর চলাফেরাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলে এ সময়ে। চিরন্তন নারীর সাজ সজ্জা পাল্টাতে চাপ তৈরী করা হয়। বাঙালীকে শাড়ী পরিধান পরিহার করতে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করা হতে থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতার, টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করা হয়। এমনকি "খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগরও জলে" কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই গানের বাণীকে রূপান্তরিত করা হলো "খেলিছে জলপরী"তে। এসবের বিরুদ্ধে কবি সুফিয়া কামাল, রোকেয়া রহমান কবীর প্রতিবাদী হন। ১৯৬৪-৬৫ সালের দিকে বাংলা ভাষাকে আরবী হরফে পাঠ করার প্রস্তাব আসে। এর ফলে প্রণীত হয় ৬৬ এর ছয় দফা। উণসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে যার বিস্ফোরণ ঘটে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগষ্ঠিতা লাভ করে। এ নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল হতে বেগম নুরজাহান মোর্শেদ, চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বেগম সাজেদা চৌধুরী যিনি বর্তমান সংসদের একজন সংসদীয় সদস্য। এছাড়াও রাফিয়া আক্তার ডলি, মমতাজ বেগম সত্তরের নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করতে পরবর্তীতে সহযোগিতা করেন।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকটে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়ায় অধিকারের দাবীতে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালী জাতি উদ্বুদ্ধ হয় ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। ভারত বাংলাদেশের পক্ষ নেয়। বীর বাঙালী অস্ত্র ধারণ করে। সকল সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অবহেলিত, অপমানিত বাঙালী জাতি সংঘঠিত হয় বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও সঠিক দিক নির্দেশনা আলোকে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও নারী:

একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবার যুক্ত ছিল। এ সময়ে পরিবারে পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা অশেষ দূর্ভোগের শিকার হয়েছিল। এটি ছিল সাধারণ কষ্ট ও মুক্তিযুদ্ধকে এক ধরনের সমর্থন যোগানো। মেয়েদের এ কষ্টের বহু ঘটনা এখনও অজানা রয়ে গেছে। কুষ্টিয়া শহরে ১৯৬৫ সালে নির্মিত আমাদের বাড়ীটি ৭ জুন'১৯৭১ এ পাক বাহিনী বিমান হতে বোমা নিক্ষেপ করলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত বাড়ীটি পুড়ে যায়। আমার পিতা মো: বজলুল হক জোয়ার্দার তখন আমার মা ও অন্যান্য ভাই-বোনদেরকে নিয়ে নিরাপত্তার কারণে কুষ্টিয়া শহর ত্যাগ করে গ্রাম পান্টিতে ছিলেন। বাড়ীতে গিয়েও হামলার শিকার হয়েছেন। মেয়েদেরকে পাক

সেনাদের অত্যাচারের ভয়ে কখনও ময়লা পুকুরে সারাদিন নিমজ্জিত রাখতে হতো। মাতৃভূমির স্বাধীনতার আশায় তাঁরা সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করে গেছেন। কলকাতার শিয়ালদহের জেলা কোর্টে পিতার সরকারি চাকুরী সূত্রে এখানে বড় হওয়া ও হুগলী হাই মাদরাসা হতে মেট্রিকুলেশন সমাপ্তকারী আমার আব্বাকে কলকাতায় ৪৭ সালের দাঙ্গার পরে বাংলাদেশে চলে আসতে হয়েছিল। যেখানে তাঁর পিতার দাদা আলী মাহমুদ জোয়ার্দ্দার ইসলাম ধর্ম প্রচারে পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান প্রদেশ হতে আগমন করেছিলেন।

সময়টা এমনই ছিল উত্তাল পৃথিবীতে স্বাধীনতার জন্য সকলে লড়াই করছে। নারীরা ৭১ এ পিছিয়ে ছিল না। তাঁরা অস্ত্র পরিচালনা হতে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যোগানো, খাদ্য তৈরী ও তা সরবরাহ, গোয়েন্দাগিরির কাজ, তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ নিতেন। বহু নারী ধর্ষিতাও হয়েছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ারা বেগম, গোপালগঞ্জের আশালতা বৈদ্য, আলেয়া বেগম, আলমতাজ বেগম, বীরপ্রতিক তারামন বিবি প্রমুখ অসংখ্য নারীর গৌরবগাথায় বাংলাদেশের ইতিহাস রক্তরঞ্জিত।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাঙ্গালী জাতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন করে। সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী, নির্যাতন ভোগকারী নারী ও সমাজের আপামর নারী সমাজের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচীর দ্বারা নারীকে স্বাবলম্বী করার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ নেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী"। ২৮ (২) অনুচ্ছেদে আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।" এ সময়ে কিছু নারী বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমানেও নারীর জন্য উন্নয়ন কাজ চলছে।

বাংলাদেশ ও নারী উন্নয়ন নীতি :

রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়ায় শাসক হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বহির্বিশ্বে প্রসিদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ একজন হিতৈষী শাসক হিসেবে নারী উন্নয়নে বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। দ্বাদশ শ্রেনি পর্যন্ত নারী শিক্ষা তিনি অবৈতনিক করেছেন। বিধবা ও বয়স্ক নারীদের ভাতা বৃদ্ধিসহ এ কর্মসূচী তিনি অব্যাহত রেখেছেন। তিনি মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বহির্বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছেন। রোহিঙ্গাদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী ও শিশু। তাদের কল্যাণে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের ওয়াসফিয়া হিমালয় জয় করেছেন। নভেরা আহমেদ একজন ভাস্কর শিল্পী হিসেবে বিশ্বে সুনাম

কুড়িয়েছিলেন। নাজমুন নাহার সুলতানা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিচারপতি। বিজ্ঞান চর্চা, খেলাধুলাতেও নারীরা পিছিয়ে নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে সচিবদের মধ্যে ১৩ জন আছেন নারী আছেন যারা দেশ কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদ, জাতীয় সংসদে নারী নেতৃত্ব রয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠনের ক্ষমতা রাখেন। যা ১৯৯৮ সালের ১৯ মে স্থাণীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাশ হয়েছে। জাতীয় সংসদে ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৫০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশের অন্যতম শিল্পখাত গার্মেন্টস এর আশিভাগ কর্মী হলো নারী শ্রমিক যারা জাতীয় আয়ের বড় অংশ সরবরাহ করে চলেছেন।

২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে পাঠরত ১,৯০,৬৭,৭৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মোট ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ৫০.৮৬ ভাগ। কিন্তুু মাধ্যমিক স্তরে এ সংখ্যা গিয়ে দাড়ায় শতকরা ২৭.৪ ভাগ। আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ অনুপাত গিয়ে দাড়ায় ৩৯.৫১ ভাগে। স্বাধীনতা পূর্ব আমলে নারীরা পরিবারের বাইরে সেভাবে অগ্রসর হয়নি। পরবর্তীতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সকলের জন্য শিক্ষাকে সার্বজনীন করা হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইনে নারীর সমান অধিকারের বিষয়টি নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এ অন্তর্ভূক্ত থাকলেও গোড়া মোল্লাদের বিরোধীতায় আজ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলিম পরিবারে নারীরা উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তি পেলেও হিন্দু পরিবারে নারীরা এখনও সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত।

বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন :

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে প্রণীত নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও), মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (টউঐজ)সহ অন্যান্য নীতি সিভিল এবং রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি (ওঈঈচজ), অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের চুক্তি (ওঈউঝঈজ) তে নারীকে বাল্যবিয়ে রোধ করার পক্ষে নীতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ১৯২৯ সালে এদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণীত হয়। মেয়েদের বিবাহের বয়স ধরা হয়েছে ১৮ ও ছেলেদের ২০। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মেয়েদের বিবাহের বয়স ১৬ হতে পারে এ সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ বর্তমানে জারী হয়েছে। তবে বাল্যবিয়ে এখনও সংঘটিত হচ্ছে যা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিরাজ করছে।

নারী ও নিরাপত্তা আইন :

যৌতুক প্রথা, ধর্ষণ, নারী উত্যক্তকরণ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ কেন সমগ্র বিশ্বে নারীরা আজ ধর্ষণ, টিজিং এর শিকার হচ্ছে। ভারতে ২০১২ সালের

১৬ ডিসেম্বর দিল্লীর একটি বাসে এক নারী ভয়াবহ ধর্ষণের শিকার হয়। ২০০৯ সালের ১৪ মে বাংলাদেশের হাইকোর্ট জনস্বার্থে করা একটি রায়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম যে সকল আচরণ নারী উত্যক্তকরণ বলে গণ্য করে ও এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে, তা হল : অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার বা রসিকতা করা, গায়ে হাত দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা। সোস্যাল মিডিয়া যেমন ফেইসবুক, টুইটার বা মোবাইলে বিড়ম্বনা, ই-মেইল বা এস. এম.এস করা, পর্ণোগ্রাফী বা কোন ধরনের চিত্র, অশ্লীল ছবি বা দেয়াল লিখন করা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা, অন্য কোনভাবে শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ যার মধ্যে যৌণ ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, কোন বখাটে যদি ছাত্রী বা অন্য যে কোন নারীকে লাঞ্ছিত, অপমাণিত করে, যৌন হয়রানি ঘটা, অনেক সময় ঘটনা শুধু ইভ টিজিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তা ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ও আত্মহত্যার ঘটনায় গিয়ে পর্যবসিত হয়। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকার একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের এক ছাত্রীকে দর্জি কর্তৃক প্রেমের প্রস্তাব দানের পর সাড়া না পাওয়ায় উক্ত ছাত্রীকে সে ছুরিকাঘাত করে। পরবর্তীতে ছাত্রীটি এ আঘাতজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করে। অন্য একটি ঘটনায় উত্যক্তের পর সিমিনের আত্মহননের ঘটনাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো। এই প্রথম- উত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানিকে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। রায়ের নির্দেশাবলী পালন সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থাৎ আইনের নিরিখে বাধ্যতামূলক। এগুলো প্রয়োগের লক্ষ্যে পদক্ষেপ না নিলে তা আদালত অবমাননার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এগুলো অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তির লক্ষ্যে ন্যূনতম ব্যবস্থা।

প্রতিকার :

কর্মক্ষেত্রে নারীরা যাতে বৈষম্যের শিকার না হন, সেজন্য সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন, উন্মাদনা সৃষ্টিকারী মিডিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ রাস্তায় নারীদের চলাচলে নিরাপত্তাদানের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। রাস্তায় পথিকদের চলাচলের জন্য মোট বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ বরাদ্দ আছে যা নিতান্তই অপ্রতুল। ২০১৪ সালে একমাত্র ঢাকা শহরে থানায় হারানো মানুষের প্রায় ৬ হাজার জিডি করা হয়। এর অর্ধেকই নারী ও শিশু। যে ব্যক্তি নারী নির্যাতন ঘটাবে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। তদন্ত চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় গোপন রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে তদ্বির বা চাপ বন্ধ করতে হবে। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী নির্যাতন ঘটনা প্রতিকারে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ শুনানীর জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্র থাকবে যা পরিচালনার জন্য ন্যূনতম একজন প্রধানসহ পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। এগুলো হলো নারীর নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচী। সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে

গার্মেন্টস এ কর্মরত নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাসহ বাল্যবিয়ে নিরোধে সমাজে সচেতনতামূলক কর্মসূচী প্রতিপালন জরুরী। বাংলাদেশ বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্ক এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর বর্তমান সভানেত্রী সুরাইয়া বেগম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব পদে। ব্রাক, প্রন্নশিকা, উইমেন ফর উইমেন প্রভৃতি এনজিও ও নারীবাদী সংগঠনগুলোও নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রশাসনিক পদ ছাড়াও শিক্ষকতা, বৈমানিক, সেনাবাহিনী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি সকল পেশায় নিয়োজিত আছেন নারী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬৫ ভাগ কোঠায় নারীরা নিয়োজিত আছেন যা নারীর ক্ষমতায়নের বিশেষ একটি দিক। সমাজের সকলকে সমাজের অনগ্রসর গোষ্ঠী নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাসহ কোন নারীর জীবন যাতে অকালে ঝরে না যায় তার জন্য সোচ্চার ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে। বহু কষ্ট ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার অধিকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের। সমস্যা সমাজেই সৃষ্টি হয় আর সেসবের সমাধান সমাজ হতেই সম্ভব।

(প্রবন্ধটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত এ ২৪/০১/১৮ ইং তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৩৪ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পঠিত হয়েছিল)

লেখক পরিচিতি
সহকারি অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রেষণ)
পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নারীর ক্ষমতায়ন

রায়হানা তসলিম

জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা- ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে এ বিশ্বজগতের প্রতিটি বিজয় ও সাফল্য এবং নবসৃষ্টির পিছনে নারীর অবদান অপরিসীম। মমতাময়ী নারী মানব শিশুকে গর্ভে ধারণ করে। পরম প্রযত্নে তাকে বড় করে, পুরুষের পাশে থেকে তাকে প্রেরণা যোগায়,ভ্রাতৃ বন্ধনে সহোদরকে আগলে রাখে। নারীর উদ্যমে পুরুষ হিমালয়ে উঠেছে, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে- জয় করেছে আকাশ। আনন্দ ভালোবাসা, প্রেরণা ছাড়াও নারী এ বিশ্ব বিনির্মাণে, নানা উদ্ভাবন আবিস্কারে এবং মাঠে ময়দানে কর্মের সুনিপুণ দক্ষতা দেখিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে নানা আন্দোলন সংগ্রামে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে নানা দেশের শীর্ষ আসনে। কর্মী, আবিষ্কারক, পর্বতারোহিনী, রাণী, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার বা বিরোধীদলীয় নেত্রীর আসনে সমাসীন হলেও এখনো বিশ্বময় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার ক্ষমতায়ণের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়নি পৃথিবীর কোথাও। এজন্য প্রয়োজন পৃথিবীময় প্রগাঢ়ভাবে প্রোথিত পুরুষশাষিত সমাজে পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন।

নারীঃ

নারীকে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি, সকল মহান সৃষ্টি ও কল্যাণকর কাজের অভিধায় আখ্যায়িত করলেও এবং নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সেই বিখ্যাত উক্তি 'তুমি একজন ভালো মা দাও, আমি একটি ভালো জাতি উপহার দেব।' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করলেও বিশ্বখ্যাত মণীষীরা নারীকে দেখেছেন অশুভ ও অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে। জগৎখ্যাত কথা সাহিত্যিক লিও টলস্টয়, নারীকে সকল 'নিরানন্দের উৎস' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি ছবক দিয়েছেন- 'মেয়েদের একটি সুবিধা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাই যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। মণীষী পাই যে গোরাম উল্লেখ করেছেন- পৃথিবীর সকল অশুভ নীতি সৃষ্টি করেছে সকল অরাজকতা, অন্ধকার এবং নারী। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট বলেছেন, 'কোন মেয়ে যখন ভাবে, তখন সে অশুভ জিনিসই ভাবে।' সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছেন, 'মেয়েরা আমাদের দাসী হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম, গাছের ফল যেমন বাগানের মালিকের সম্পত্তি, মেয়েরা তেমনি আমাদের সম্পত্তি। মেয়েদের সমান অধিকার পাগলামো ছাড়া আর কিছু নয়, মেয়েরা শুধুই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। 'জার্মান প্রবাদে উল্লেখ রয়েছে, 'একটি নারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে একটি বিবাদ কমে যায়।' মণীষী টেনিস বলেছেন, 'পুরুষ থাকবে মাঠে আর নারী থাকবে রান্নাঘরে। পুরুষের হাতে থাকবে তলোয়ার,

মেয়েদের আঙ্গুলে থাকবে সুঁচ। পুরুষের আছে মাথা, মেয়েদের আছে হৃদয়, পুরুষ আদেশ করে আর মেয়েরা পালন করে; এর ব্যত্যয় হলেয় বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য।' নারী সম্পর্কে এ ধরণের নেতিবাচক ধারণার পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় সব দেশেই কতগুলি প্রচলিত নেতিবাচক কথা আছে। যেমনঃ 'গৃহবধুরা অত্যন্ত বুদ্ধিহীন, তাদের স্থান ঘরে। মেয়েরা যা কথা বলে সেগুলি কেচ্ছা। একজন চালাক- চতুর মেয়ের মস্তিষ্ক বলে কিছু থাকেনা। মেয়েরা অর্থের মূল্য বুঝেনা, চাকুরে মেয়েদের নারীত্ব থাকেনা। বুদ্ধিমতী মেয়েরা পুরুষালী হয়। সব মেয়েরাই কেবল পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ভাবে। নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলা মেয়েদের কর্তব্য। মেয়েরা সর্বদাই পুরুষদের ফাঁদে ফেলতে ইচ্ছুক। মেয়েরা প্রায়শই পরনিন্দা চর্চা করে। মেয়েরাই মেয়েদের ঘৃণা করে। মেয়েরা সবসময়ই কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। একজন মেয়ে যদি কোন পুরুষকে বাধতে না পারে তবে সে যথেষ্ট মেয়েই নয়।' বলা বাহুল্য যে, এত সব নেতিবাচক মন্তব্য উপেক্ষা করে এবং সকল বিরূপতা মোকাবেলা করে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজও অবধি নারী তার সমহিমা নিয়ে মানব সভ্যতা বিকাশে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। নারী আসলে সৃষ্টির আধার। একারণে মা-মাটি ও বসুন্ধরা একে অপরের পরিপূরক। এই নারী আবার ছলনাময়ী, রাক্ষুসী এবং বিধ্বংসী। সময়, পরিবেশ তার প্রতিপক্ষের আচরনই তাকে এ বিমূর্ত রূপ ধারণ করতে বাধ্য করে। যুগে যুগে দেশে দেশে নারির প্রতি ভালোবাসার কাহিনী যেমন আছে, গঞ্জনার ইতিহাসও কম নয়। আদি যুগ থেকে বর্তমান অবধি নারীকে ভোগ্য পন্য হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতাও কমেনি। জন্মলগ্ন থেকে নারী- শিশু পরিবারে-সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী বৈষম্যের শিকার হয়। এই বৈষম্য সয়ে সয়ে একদিন তার আয়ু শেষ হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সংবিধানে এমনকি জাতসংঘের সনদে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ ও প্রতিফলন কোথাও নেই। পৃথিবীর কোথাও দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর অবস্থান সদৃঢ় নয়। সবচেয়ে বড় কথা নারীর নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও তার নেই। এ সংকট পৃথিবীর সব নারীর জীবনেই বিরাজমান। এ থেকে মুক্তি পায়নি নীলনয়না- রাজকুমারী ডায়না, সূর্যদয়ের দেশ জাপানের অসিন, বাংলাদেশের শবমেহের, এমনকি হাল আমলের পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই। কিন্তু এ অভিমুন্যের গৃহ থেকে, এ সংকট থেকে নারীকে বেরিয়ে আসতে হবে। নিজের সম্পর্কে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তার পূর্বশর্তই হলো নারীর শিক্ষা, তার অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নই নারী মুক্তির একমাত্র পথ। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীমুক্তি ছাড়া বিশ্বমানবতার মুক্তি নেই। এ সত্য উপলব্ধি করেই ক্ষমতায়নের পাদপ্রদীপে নারীর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ক্ষমতায়নঃ

ক্ষমতায়ন একটি দুরূহ ও বহুমুখী প্রপঞ্চ। সাধারণত বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রনকে ক্ষমতা বলে। এ ধারণাটি চার ভাগে বিভক্ত। যথাঃ

১) ভৌত (জমি, পানি, বল), ২) মানবিক (মানুষ, মানুষের শারীরিক শ্রম ও দক্ষতা) ৩) অর্থনৈতিক (অর্থ, অর্থের অভিগম্যতা) এবং ৪) বুদ্ধিবৃত্তিক (জ্ঞান, তথ্য, ধারণা)।

ক্ষমতায়ন শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Paulo Faire। বিগত শতকের আশির দশকে ক্ষমতায়ন শব্দটি একটি জনপ্রিয় পরিভাষা হয়ে উঠে। আসলে ক্ষমতায়ণ হচ্ছে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার একটি প্রক্রিয়া। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে Chandra বলেন, 'Empowerment in the simplest form means the manifestation of redistribution of power that challenges patriarchal ideology and the male dominance' (Chandra 1977)

ক্ষমতায়ন সাধারণত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

i) Ability to participate in decision making
ii) Control over economic resources and
iii) Change and equal opportunity.

ক্ষমতায়নের ধরন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানারকম হতে পারে। তবে বর্তমানে ক্ষমতায়ন শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মেয়েদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণকে ঘিরে।

নারীর ক্ষমতায়নঃ

দক্ষিণ এশিয়াতে নারীর ক্ষমাতায়নের ক্ষেত্রে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেয়া হয়,

i) integrated development (সমন্বিত উন্নয়ন)
ii) Economic development (অর্থনৈতিক উন্নয়ন) এবং
iii) Awareness rising (সচেতনতার জাগরন)

আসলে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায় জেন্ডার বৈষম্যবিহীন এক পৃথিবী বিনির্মাণ, যেখানে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার জীবনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। নারীর ক্ষমতায়নের মূল উদ্দীষ্ট হচ্ছে, ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। এর মূল লক্ষ্য হলো, নারীর সকল সম্ভাবনার এবং সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন। তার উপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যঃ

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। এর অন্যতম প্রধানস্থানীয় লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ-

ক) পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং নারীর অধীনতার প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটন করা।
খ) নারীর বস্তুগত সম্পদজ্ঞান এবং সম্পদের উপর অভিজ্ঞম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ।
গ) নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমন্বিত ও জোরদার করে যে কাঠামো ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান (যেমন- পরিবার, বর্ণ, জাতি, প্রথা, শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, রাজনীতি, অর্থনীতি

ইত্যাদি) তা রূপান্তর বা পুনঃমূল্যায়ন করা।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা:

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পদে পদে রয়েছে প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতার কথা বোলএ বা লিখে শেষ করার মত নয়। তবে মোটা দাগে উল্লেখ করার মত প্রতিবন্ধকতা হলো-

ক) সনাতন মূল্যবোধ, খ) পিতৃতন্ত্রের অনুকূলে রচিত আইন কানুন, গ) ধর্মীয় অনুশাসন, ঘ) আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের অনুসরন, ঙ) বৈরী কর্মপরিবেশ, চ) অশিক্ষা ও ছ) কুসংস্কার।

নারীর ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক অবস্থা:

সারা বিশ্বে বর্তমান বাস্তবতায় নারীর অবস্থান প্রত্যাশার অনেক নিম্নধাপে অবস্থিত। আমেরিকার মত দেশে এখন পর্যন্ত একজন নারী প্রেসিডেন্ট পাওয়া যায়নি। বৃটেনে এখনো কোন নারী পার্লামেন্টের স্পীকার নির্বাচিত হয়নি। সেই তুলনায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি রোল মডেল। স্থানীয় সরকার, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে নারীর ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে নজিরবিহীন। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উনিশ জন নারী সরাসরি নির্বাচিত হয়েছে। বর্তমানে (ডিসেম্বর ২০১৩) সংরক্ষিত আসন সহ জাতীয় সংসদে উনসত্তর জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, বিরোধীদলীয় নেত্রী, মন্ত্রী, হুইপ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নারীর এমন সুদৃঢ় অবস্থান বিশ্বে কোথাও নেই। সরকারি চাকুরিতে নারীর অবস্থান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পুলিশ, সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীতেও নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন উর্ধ্বচারী হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী দেশের ৫কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। গার্হস্থ্য কর্মে নিয়োজিত নারীদের এই সঙ্গে যোগ করলে এই সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার বেশি হবে। ৮৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে বর্তমানে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। গার্মেন্টস খাতের আশি ভাগ কর্মীই নারী। দেশের নব্বই শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীও নারী। নারী বিনা পারিশ্রমিকে বা কম পারিশ্রমিকে যে শ্রম দান করে অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাতের মতে জিডিপির তা শতকরা ৪৮ ভাগ। আমদের মহান সংবিধানে (অনুচ্ছেদ ২৮, ২৯, ৬৬ ও ১২২) জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত। নারীর কল্যাণে আলাদাভাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় রয়েছে। নারীর সুরক্ষা ও অগ্রগতির জন্য প্রণীত হয়েছে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন, নারী নির্যাতন (নিবর্তন) আইন, যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন, প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলকরণ) আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, পারিবারিক আদালত

বিধিমালা, এসিড অপরাধ দমন আইন, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, নারী ও শিশু নির্যাতনদমন আইন, নারী ও শিশু নির্যাতনদমন (সংশোধন) আইন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন প্রভৃতি। নারীর অনুকূলে আইন-বিধি ও নীতিমালার মধ্যে সিডিও সনদের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ২০১১ সালে চূড়ান্তভাবে পুনরায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে ৩৩ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে করা নির্বাচন কমিশনের বিধান (২০০৮), সন্তানের পরিচয়ে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম বাধ্যতামূলক করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী নিয়োগের বিধান তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য) নির্ধারণে ২০০০ সালে যে ৮টি লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে তার তৃতীয়টি হলো প্রমোট জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের কোথাও নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেনি। এর কারণ পদে পদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিছিয়ে থাকা প্রতিবন্ধকতা, শারিরীক অক্ষমতা এবং বৈষম্যময় পরিবেশ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এখনো অনেক বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়:

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিচে উল্লিখিত উপায়সমূহ চিহ্নিত করে নারীকে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে হবে।

ক) শিক্ষার আলোতে নারীকে আলোকিত করতে হবে।
খ) ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে হবে।
গ) অন্তরের ও বাইরের শক্তি দ্বারা নারীকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে হবে।
ঘ) ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান তালে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন উপর- নীচ বা একমাত্রিক প্রক্রিয়া না হয়ে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হতে হবে।
চ) নারীর ক্ষমতায়ন অবশ্যই তার অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবে।
ছ) নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ক্ষমতার ধারণার পরিবর্তন আনতে হবে।
জ) নারীর ক্ষমতায়নকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে।
ঝ) নারীর বিপক্ষে সকল সনাতন মূল্যবোধ অবদমন করতে হবে।
ঞ) পিতৃতন্ত্রের সপক্ষে রচিত সকল আইন-কানুন রোহিত করতে হবে।
ট) কুসংস্কার ও ধর্মের নামে নারীর অগ্রযাত্রাকে অবদঅমিত করা যাবে না।
ঠ) জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নির্বাচিত নারীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করতে হবে।

ঙ) নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন সকল আইন পরিবর্তন করতে হবে।
ণ) প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করতে হবে।
ত) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অভিগম্যতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে।
থ) সকল ধরণের কাজে নারীর অভিগম্যতার পাশাপাশি ঘর-গৃহস্থালীর কাজে পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
দ) সর্বজনীন নারীর স্পক্ষে পারিবারিক সর্বজনীন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
ধ) দৈশিক ও বৈশ্বিক উন্নয়ন ধারায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
ন) পুরুষের মত নারীর ক্ষেত্রে রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন সুদৃঢ় করতে হবে।
প) নারীর কাজের সমান পারিশ্রমিক ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

উপসংহার:

বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির পরও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। নারীর সপক্ষে ভুরি ভুরি আইন প্রণয়নের পরও বিশ্বের কোথাও নারীদের নিরাপত্তা নেই। রাজনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি নারীর প্রতি সামাজিক সহিংসতাও বিশ্ব বিবেককে আতঙ্কিত করে। মানব সমাজ জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে যতই সভ্য হোক না কেন নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশার তুলনায় অনেক নিম্নগামী। বিশ্বায়নের এই যুগে তাই নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন, নির্যাতন, বৈষম্য, বঞ্চনা, অবহেলা মোটেও কাম্য নয়। প্রকৃত অর্থে নারী সমাজকে যথার্থ মুল্যায়ন ও মর্যাদা না দিয়ে সমাজ গঠনে নারীর সক্রিয় ভূমিকা আশা করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিত। বিশ্বের অর্ধেক নারী সমাজকে ক্ষমতায়িত না করে তাকে 'অবরোধবাসিনী' মনে করে কোন ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা, নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে তাকে সম্পৃক্ত না করলে কোন দেশ বা জাতির প্রত্যাশিত উন্নয়ন সাধিত হবে না। তাই নারীকে মানুষ ভেবে, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এনে ক্ষমতায়নের উচ্চগ্রামে নারীর অবস্থান সুদৃঢ়করণের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব। মনে রাখতে হবে শুধু নারীর ক্ষমতায়নই তার মুক্তি নিয়ে আসবে না। নারী মুক্তির জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন। পৃথিবীর সকল প্রান্তের পুরুষ যতদিন না তার সহযোগী, তার সহযোদ্ধা ও সহমর্মী ভাবতে শিখবে এবং যতদিন না নারীকে পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাবতে শিখবে- ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না।

লেখক পরিচিতি
উপ-প্রকল্প পরিচালক, টিকিউ আই-২ প্রকল্প
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও ভোটাধিকার

সালমা বেগম

নারী ক্ষমতায়ন শুধু নারী বিষয়ক কোন উৎস নয়। এটি নারী-পুরুষ উভয়ের চেষ্টার ফল। সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক সমকক্ষতা ও মর্যাদা আনয়নে নারীদের পুরুষের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা তথা সারা বিশ্বের মানবাধিকার নেত্রী উইনী ম্যান্ডেলা বলেন, 'নারী স্বাধীনতা যতদিন অর্জিত না হবে ততদিন নারীর উপর নির্যাতন বন্ধ হবে না। আমরা নারী-এই মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব।' "নারীর নিজের পথ, নিজের অবস্থান নারীকেই নির্ধারণ করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই নারী আন্দোলনের সূত্রপাত। সর্বকালের এবং বিশেষ করে আজকের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে নারী যদি নিজেদের ভাবতে ভুলে যায়, তাহলে তাদের কেউ মনে রাখবেনা।

রাজনৈতিক তথা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজ প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী যখন নতুন এক শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ঠিক তখনই সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে হিলারী কিনটন বলেন যে, 'জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর যে অবদান তার সেলিব্রেশনের জন্য এ এক অনন্য আয়োজন। মা নেত্রী হিসেবে ঘরে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে নারীর যে অবদান তারই সেলিব্রেশন করতে এ সম্মেলন। আমাদের চেহারায়, উপস্থাপনায় ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন উপাদানের চেয়ে সংগঠিত করতে পারে এমন উপাদান বিস্তর। আমাদের সকলের ভবিষ্যত এক ও অভিন্ন এবং আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এমন একটি সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে যা গোটা বিশ্বের নারী ও মেয়েদের জন্য সমান ও মর্যাদা স্থাপনে সহায়তা করবে। এবং তার মাধ্যমে তাদের শক্তি এবং স্থায়ীত্ব নিশ্চিত হবে।"

আন্তর্জাতিক নারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান International Research and Training Institute for the Advancements of Women তাদের Gender concepts in Development Planning এ ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, 'Empowerment is the process of generating and building capabilities to excercise control over one's own life. Women's empowerment is a model of gender analysis that traces women's increasing equality by empowerment through five phases, Viz., welfare, access, coscientisation, participation and control' নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে, "বস্তুতঃ বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান বিষয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে নারী শিক্ষা, তাদের মালিকানার ধরণ এবং কর্মস্থানের সুযোগ ও শ্রমবাজারের কার্যপদ্ধতি। তবে এসব 'ধ্রুপদী' পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোর বাইরে আরো রয়েছে কর্মসংস্থানের ধরনের ব্যবস্থা, মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি সার্বিকভাবে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যা এসব দৃষ্টি উৎসাহিত করে কিংবা পরিবর্তনে বাধা দেয়।"

সভ্যতার উৎস মূলে বরাবরই প্রেরণা যুগিয়েছে নারী। প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগম রোকেয়ার মতে, একজন নারী আত্মনির্ভরশীল হলেই তার মুক্তি বা প্রগতি সম্ভব। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠতম, আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গি বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনায় ফুটে উঠেছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আত্মজাগরণ, কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামের ভেতর দিয়েই নারীকে মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নিতে হবে। নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং নারীর আলাদা সত্ত্বার স্বীকৃতি প্রয়োজন। এটি বেগম রোকেয়ার একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি। তার এ উপলব্ধির ফলে আজকের নারী এসেছে অনেক দূর।

বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। কিন্তু আজও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলি জেন্ডার ইস্যু ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করলেও দেখা যায় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়। এই অবস্থায় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের দাবী রাখে। এক্ষেত্রে ভোটাধিকার নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সমাজকে ঢেলে সাজাতে হবে। ফিনল্যান্ডের নারী প্রগতিবাদী সাময়িকী "আমরা নারী" (Me Naiset) ১৯৮০ সালে ঘোষণা করে "যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করবো, তখন আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।... নারী এত দূর্বল নয় যে, বিশ্বে পরিবর্তন আনতে পারবেনা। আমাদের শুধু নিজেদের প্রতি আস্থা রাখতে শিখতে হবে। আমাদের জীবন ও আমাদের ইউটোপিয়ার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। আর তাই শুরু হয়েছিল ভোটাধিকার অর্জনে নারীদের আন্দোলন।

পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর ভোটাধিকার স্বীকারকারী প্রথম দেশ নিউজিল্যান্ড। এ দেশই একমাত্র দেশ যেখানে উনবিংশ শতাব্দীতে নারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন দেশের নির্বাচনে নারীদের ভোটদানের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন। ইউরোপে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছিল। ইংল্যান্ডে কিন্তু ১৬৯০ সালে সংসদীয়

আইন মোতাবেক এক বিধান জারি করা হয়। সেখানে বলা হয় নারীর ভোটদানের যোগ্য নয় বলে তাদের ভোটদানের অধিকার নেই। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন লক নারীর ভোটাধিকারের প্রতি বিরুদ্ধে মত পোষণ করতে গিয়ে তাঁর Two treatises on civil government বইয়ে বলেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর উদ্দেশ্য একক, কিন্তু তাদের বোধশক্তি ভিন্ন ভিন্ন, ফলে কখনও কখনও তাদের ইচ্ছার বিভিন্নতা ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একজনের হাতে থাকা উচিত এবং অপরিহার্যভাবে তা পুরুষের হাত থাকা উচিত। কারণ পুরুষ অধিকতর সমর্থ ও শক্তিশালী। অর্থাৎ জন লকের ধারণা ছিল সরকার গঠনে অভিমত প্রদানকারী সকল জনগণই পুরুষ।

নারীদের ভোটাধিকার আদায়ের জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন তিনি হচ্ছেন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভানেত্রী চ্যাপম্যান ক্যাট। ১৯১৪ সালে এক রিপোর্টে তিনি বলেন যে, "৫২ বছর ধরে ভোটাধিকারের জন্য নারীরা একাধিক্রমে সংগ্রাম চালিয়েছেন। ৫৬ বার প্রচার চালাতে হয়েছে পুরুষ ভোটারদের সমর্থন চেয়ে। ৪৮০ বার প্রচার চলেছে সংশোধনীর দাবিতে, ৪৭ বার প্রচার আন্দোলন হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ভোটাধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে, ৩০ বার আন্দোলন হয়েছে দলীয় রাজনৈতিক সংগঠনে দাবি অর্ন্তভুক্তির জন্য, ১৯ বার নারীরা এই দাবি তুলেছেন ১৯টি সম্মেলনে।" এতে নারীদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ব্যাপারটা অনেক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দেখা যায়, যে দেশে সাক্ষরতার হার বেশি, সে দেশে ভোটারের সংখ্যাও বেশি। কারণ নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার অভাব নারীকে তার ভোট প্রয়োগ করার ক্ষমতা থেকে বিরত রাখে। বাংলাদেশের অনেক গ্রাম এলাকায় ধর্মীয় গোড়ামী ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারনে নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যান্ডে ভোটাধিকার আন্দোলনের এক অংশের নেতৃত্বে ছিলেন Emmeline Pankhurst ও Millicant। বৃটিশ নারীবাদীরা নীরব প্রতিবাদে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা সরকারি ভবনের সঙ্গে নিজেদের শিকলে বেঁধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং জোরপূর্বক পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে আওয়াজ তুলেছিলেন। অবশেষে ১৯১৮ সালে ৩০ বছরের বেশি বয়সী নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এটি ছিল বৈষম্যমূলক। কারণ ২১ বছর বয়সী সকল পুরুষের ভোটাধিকার ছিল। ভোটের ব্যাপারে পুরুষের সম অধিকারের আন্দোলন চলতে থাকে এবং একযুগ পরে ১৯২৮ সালে ২১ বছর বয়সী সকল বৃটিশ নারী ভোটধিকার অর্জন করে। এবং ভোটের ব্যাপারে নারী-পুরুষ সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে নারীর ভোটাধিকার লাভ করা দীর্ঘ সংগ্রাম ১৯২০ সালে সংবিধান সংশোধন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। তবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক পরিবারে পুরুষ সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী নারীরা ভোট দেয়।

পুরুষদের এ মনোভাব পরিবর্তন করতে পারলে আগামীতে আরো বেশি মহিলা নির্বাচনে ও রাজনীতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হবে।

একথা সর্বজনবিদিত যে মানব সভ্যতার অগ্রগতি নারীর ক্ষতায়নের জন্য নারীর ভোটাধিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ সময়ের দাবী। একবিশ্ব শতাব্দীতে এসে নারীরা এখন অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আশানুরূপ সহযোগিতা ও সুযোগের মাধ্যমে নারীরাও তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম। এ কারণে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভোটাধিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুস্পষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ অপরিহার্য।

লেখক পরিচিতি
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

পরিবেশ ও নারীবাদ

প্রফেসর নাছিমা আক্তার চৌধুরী

পরিবেশ নীতিবিদ্যা ও নারীবাদের মূলস্রোতের বাইরে নতুন সংযোজন পরিবেশ - নারীবাদ। ১৯৭৪ সনে ..... দোবন প্রথম Ecofeminism শব্দটি প্রকাশ করেন। মূলত নারীর প্রতি কর্তৃত্ব ও প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিষয়ক মতামতকে নিয়ে হচ্ছে পরিবেশ - নারীবাদ। পরিবেশ বিপর্যয় ও পরিবেশ শোষণ নারী বিষয়ক ইস্যু, কেননা এ সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা আসলে নারী পীড়ন ও নারী অধিকার হরণের বিষয়টি সম্বন্ধেও মানুষকে সচেতন করে তুলবে। পরিবেশ শোষণ করলে যেমন পরিবেশ নির্যাতিত হয়, নারী পীড়নেও তেমনি নারী নিগৃহীত হয়। এভাবে দেখা যায় যে, পরিবেশ ও নারী উভয়ে পুরুষ - শাসিত সমাজের আধিপত্য দিয়ে অবনত, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

According to eco-feminism, the connections between the oppression of women and the oppression of nature ultimately are conceptual: They are embedded in a patriarchal conceptual framework and reflect a logic of domination which function to explain, justify, and maintain the subordination of both women and nature. Eco-feminism, therefore, therefore, encourages us to think ourselves out of "patriarchal conceptual traps" by reconceptualizing ourselves and our relation to the nonhuman natural word in no patriarchal ways*

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ। নারী এদেশে চরমভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে প্রতিদিন। পরিবারের ভরণ পোষণের দায়িত্বের কাজে যেমন পুরুষ নিয়োজিত তেমনি নারীও ঐ দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু উভয়ের প্রতি পরিবারের রয়েছে বৈষম্য নীতি। পরিবারের প্রতি নারীর কর্তব্য ও দায়িত্বকে স্বীকার করা হয় একতরফাভাবে, কিন্তু বিপরীতভাবে নারীর প্রতি পরিবারের কর্তব্য ও দায়িত্বকে অস্বীকার করা হয়।

পরিবেশ ও নারী নিবিড় আন্তসম্পর্কের দু'টি প্রপঞ্চের প্রতি সমাজের চিন্তা ধারা, প্রত্যাশা ও মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটাতেই হবে। পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাধ্যমে যেমন প্রকৃতিকে নির্মল, বিশুদ্ধ ও দূষণমুক্ত করা যায় -তেমনি নারীর মানবিক মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের এ অপরিহার্য শক্তিটির বিকাশও নিশ্চিত করা হয়।

পরিবেশ- নারীবাদ নারী এবং পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বআরোপ করে। 'পরিবেশ-নারীবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' এর পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে পারে। আমি এর কয়েকটি দিক নির্দিষ্ট করে তার আলোকে ব্যাখ্যা করব।

জলবায়ু এবং উদ্ধাস্ত নারী: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বজুড়ে খড়া এবং মরুকরণ প্রক্রিয়া বাড়বে, প্রতিনিয়ত দাবানল সংঘটিত হবে, ভূমি ও পাহাড়ের ধস নামবে, বন্যা-সাইক্লোন ইত্যাদি অনবরত মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করবে বেঁচে থাকার জন্য একদল মানুষকে বসতি গড়তে হবে অন্য জায়গায়। কিন্তু খরা এলাকায় মানুষ যদি শস্যের সন্ধানেঅনত্র যায়, সেখানে আর্সেনিকমুক্ত পানি পাবে কি না সেই নিশ্চয়তা নেই। বেঁচে থাকার জন্য স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবে মানুষ ক্রমাগত উদ্ধাস্ত হতে থাকবে। উন্নয়ন ইস্যুতে বিষয় গভীর ভাবনার বিষয়। ঘর-বসতি বিপন্ন হওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হয় পরিবারের নারী সদস্যরা। নারী তার স্বাভাবিক কার্জকর্ম যেমন করতে পারে না, তেমনি ভয়ানক রকমের রোগ-ব্যধির শিকার হয়।

জলাভূমি ও নারী: জলভূমির সাথে স্থানীয় জলাভূমিনির্ভর নারীদের জীবন এর বৈশিষ্যময় সম্পর্কের মাধ্যমে জড়িত। বিদ্যমান আইন-নীতি বা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর জলাভূমি জ্ঞান, সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু একটি জলাভূমি সংরক্ষণ, জনগণের উন্নয়ন এবং নারীর জলাভূমিনির্ভর জীবনের অধিকার নিশ্চিতকরণে সমানভাবেই জরুরি।

জীববৈচিত্র ও নারী: উদ্ভিদ উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নারী ও পুরুষের জ্ঞান ও শ্রমের ভিন্নতা রয়েছে। আর এই ভিন্নতার কারণেই নারী ও পুরুষ পৃথক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। কোনো কোন সমাজে অর্থনীতি, জিববৈচিত্র ও নারী আবহাওয়া, সংস্কৃতি, শারীরিক সামর্থ, ধর্মীয় বিধি - নিষেধ ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নারী ও পুরুষের শ্রমের বিভাজন হয়। নারীরা পুরুষের চেয়ে কম শিক্ষিত ও বাইরের পৃথিবী থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ায় সমাজে তাদের মেলামেশার সুযোগ কম থাকে। আবার ভিন্ন চিত্রও দেখা যায়, ভেষজ কোনো উদ্ভিদ সংগ্রহ করার জন্য নারীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলাচল করে, আত্মীয় পরিজনের সাথে সহজেই সম্পর্ক তৈরি করে। সামাজিক একটি নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে তার এ জ্ঞান সঞ্চালন করে। পরিবারের ছেলেমেয়েদের শুধু নির্দেশনার মাধ্যমেই নয়, সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে সঞ্চালিত করে থাকে। নানারকম গল্প, কবিতা, গান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মাধ্যমে ঐতিহ্যগত খাদ্য, বিভিন্ন প্রথাগত কর্মকা- ও উদ্ভিদের জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য শিশুদের প্রভাবিত করে। এই কারণে কোনো কোনো ভাষার মানবজাতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় শস্যকে 'মা' বলে সম্বোধন করা হয়।

শিল্পায়ন ও নারী: শিল্পায়নের সাথে সাথে নারীদের কাজের ক্ষেত্র, শ্রম, সময় ও সুযোগ ভিন্নতর হতে থাকে। নারীদের উপার্জন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বাড়িতে বাগান করা, ঐতিহ্যগত উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও খাবার প্রস্তুতে সুযোগ কমে যেতে থাকে। শিল্প - কারখানার সংখ্যা বাড়ার সাথে শ্রমিকদের কদর বাড়ছে কিন্তু নারীদের কৃষিকাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে অবহেলা করা হচ্ছে। সাথে সাথে পরিবারে ও

সমাজে লিঙ্গীয় বিচারে শ্রম - বিভক্তির পরিবর্তন হচ্ছে। কৃষিকাজের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের সাথে সাথে জীববৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে। এই ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে। মানুষ ক্রমশ কৃত্রিম ও সহজলভ্য জীবনযাপনে আকৃষ্ট হয়ে আদি অকৃত্রিম ঐতিহ্যকে হারাতে বসেছে। এক সময় যা পরিণত হবে ভারসাম্যহীন এক পৃথিবীর। জীববৈচিত্রের এই অবলুপ্তি রোধের জন্য, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ওপর নানা রকম গবেষণা চলছে। সেখানে নারীদের গুরুত্ব ও লিঙ্গীয় বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে।

পানি ও নারী: মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণায় পানিকে কোনো সুস্পষ্ট অধিকারের বাইরে রাখা হয়। কেননা পানি জীবনের জন্য এতটাই অপরিহার্য, একে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পানিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং এখন একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সর্বজনসীকৃত। পানির সঙ্গে নারীর নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। পানীয় জল ও গৃহস্থলি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহের দায়িত্ব বর্তায় নারীদের ওপর। পানি সংগ্রহে দীর্ঘসময় ব্যয় হওয়ায় নারীরা বঞ্চিত হন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ থেকে।

বননির্ভর নারীর জীবন: পাহাড় কাটা, পাহাড়ের পরিবেশ বিনষ্ট করা, পাহাড় বিধ্বস্ত হওয়ার সাথে সরাসরি স্থানীয় মানুষ ও প্রাণবৈচিত্র্যের বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কিত। পাহাড় নারীদের কাছে জীবনযাপনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। বননির্ভর নারীর কুড়িয়ে পাওয়া শাক পাতা, ফলমূল ভেষজ, জ্বালানি, গৃহস্থালি উপকরণ, ধর্মীয় আচার জীবন পালনের উপাদন সংগ্রহ এসব নানা কিছুর জন্যই পাহাড়ি নারীরা সরাসরি পাহাড়ের উপর নির্ভরশীল। পাহাড়ি নারীদের ঐতহ্যগত ব্যবহারের মাধ্যমে পাহাড়ের স্থায়িত্বশীল ব্যবহার ঘটে। কিন্তু পাহাড়ি নারীদের পাহাড়ের অধিকার কেড়ে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক পাহাড় ব্যবসা ও উন্নয়ন কর্মকা- পাহাড় কেটে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে আর বিপন্ন হয়ে উঠেছে নারীর নিরুপদ্রব পাহাড়নির্ভর জীবন।

মানবজীবনের ব্যাপক ক্যানভাস জুড়ে পরস্পর নির্ভর এ দু'টি উপাদান-'পরিবেশ ও নারী' তথা পরিবেশ নারীবাদ সম্পর্কিত এই লেখার মাধ্যমে আমি সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের নৈতিক পুনর্গঠন প্রত্যাশি।

উপসংহার: পরিবেশবাদ আর নারীবাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে একটি গভীর যোগসূত্র। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায় মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে। ফলে বর্তমানে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে অনৈতিক রূপ দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবদমনের সম্পর্ক, আর তারও মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ।

নারীর উপর জেন্ডারভিত্তিক যে নির্যাতন হচ্ছে নারীবাদ তা অবসানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এজন্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে। সমাজে আমরা জেন্ডার বৈষম্য ভিত্তিক নির্যাতনের মূল হিসেবে পুরুষত্বের সংস্কৃতি লক্ষ্য করছি, অন্যদিকে প্রকৃতির

উপর নির্যাতনের মূল হিসেবে মনুষ্যত্বের সংস্কৃতি লক্ষ্য করছি। পরিবেশবাদ ও নারীবাদ উভয় মতবাদ যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে তার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক অআধিপত্যবাদ প্রতিরোধ করা; এই আধিপত্যবাদ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে মানবজাতির একটি লিঙ্গের কাছে অর্থাৎ পুরুষ জাতির হাতে কুক্ষিগত করে রাখছে এবং প্রকিত ও নারীর স্বতঃমূল্য সত্তাকে অগ্রাহ্য করে তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন করছে।

পরিবেশবাদী আন্দোলন ও নারীবাদী আন্দোলন উভয়ের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে সচেতন মনোভাব লক্ষ করা যায়।

আজকের দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এ আন্দোলন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। কারণ প্রকৃতির প্রতি সমাজের আগ্রাসী মনোভাব আমাদের সত্যিই আতংকিত করছে। একদিকে শিল্পায়ন হচ্ছে অন্যদিকে কলকারখানার বর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে। ভূমি দস্যুদের ভয়াল থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না নদী, নালা, খাল বিল, অন্যদিকে নারী নিগৃহীত হচ্ছে নানাভাবে। নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার এ দেশের নারী। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে নারী নির্যাতিত ও শোষিত হচ্ছে এদেশে। কাজেই আজকের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সময় এসেছে 'পরিবেশ ও নারী' বিষয়ক আলোচনাকে জোরদার করা। পরিবেশ ও নারীর প্রতি সম্মান জানতে হবে। পরিবেশের মাঝে চেতন-অচেতন সত্তাসমূগের প্রতি নৈতিক হতে হবে তেমনি নারীকে মানুষ হিসেবে তথা ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করার উপর ও গুরুত্বআরোপ করতে হবে। সবশেষে বলা যায় যে নারী নিপীড়নের ডিসকোর্সের বিপরীতে 'নারীর প্রতি সম্মান অর্থাৎ নারী ও মানুষ এই ডিসকোর্স প্রচলিত করতে হবে। এমন ডিসকোর্স নতুন মানবিক দৃষিভঙ্গি তৈরি করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

লেখক পরিচিতি
বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ
সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

Action Research As a Means of Intelligence Led Policing

Research is an art of scientific investigation. It is a movement from know to unknown. It is actually a voyage of discovery. Formally, a detailed study of a subject especially in order to discover (new) information or reach to a (new) understinding. Whereas, Action Research is a practical approach to prefessional inquiry in any social situation. Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions. Carr and Kemmis (1986) describe action research as being about:

The improvement of practice.
The improvement of the understanding of practice.
The improvement of the situation in which the practice takes place.

Aim of conventional and Action Research:

The aim of conventional research is generally to answer the question "what is happening here?" Whilst the aim of action research is to answer the question "how can i improve what is happening here?

Action Research is a Cycle

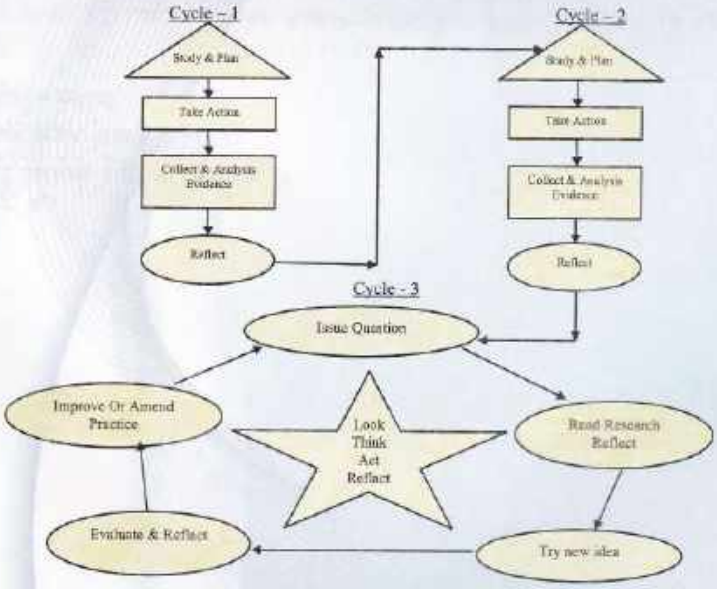

Action Research Process

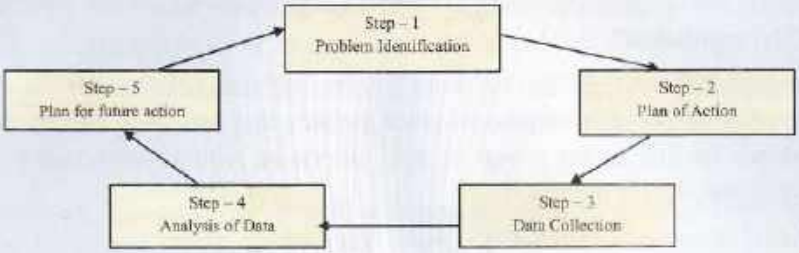

Similarly, Intelligence is the end product of an analytic process, pictorially

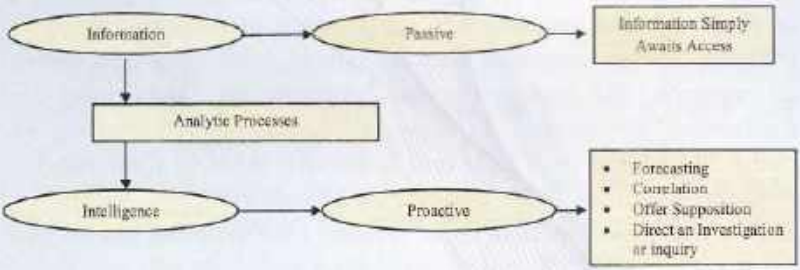

Intelligence Cycle

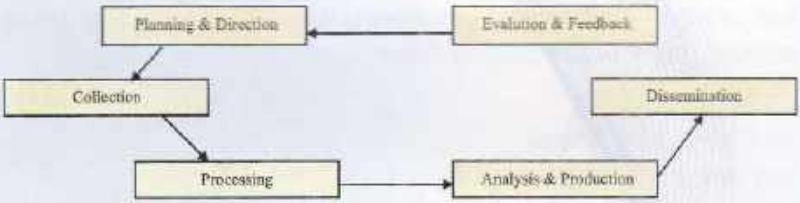

The cycle is a continuous loop that can be manipulated to fit a specific mission or activity.

Intelligence is an excellent tool to guess and apprehend in advance the probable threats and consequences of adversary agents or elements that gives early warning to the national leaders and executive who might have time to avert the risk and damage to the nation. Intelligence is nothing but action research.

In any research authensity of information is one of the prior conditions of decision making. To ensure that information is valid

and reliable, at least three sources must be consulted or techniques must be used to investigate the same topic which is called "Triangulation".

Feasibility analysis can be done whether by matrix scering or any other method to determine whether the outcome can bring expected result for the target group or not, otherwise, components can be readjusted with the result.

ASP Tanzina Chowdhury (from Sunamganj district) currently working in research and development cell in RAB HQ as an assistant director. She has completed her Honors and Masters degree in Statistics from Jahangirnagar University. She also achieved Masters Degree in Police Science (MPS) from University of Rajshahi later on. She has participated in a large number of training courses, seminars and workshops from home and abroad on research. She took professional training on "Monitoring and Evaluation" in Bangkok. In addition, she has participated in FTC and ERM course in NAEM and subjective training (Statistics) in NU. She also took basic training in Sharda Police Academy and placed 3rd position and as a reward took training on "Cyber Security" in India. She was in probation in Dhaka district. Before police service she was in Dhaka college as a lecturer of Statistics and research officer in an International research organization. She has several publications on international journals. She is an enlisted singer in Bangladesh Betar.

Women and Men in Bangladesh Facts and Figures

Mst. Maksuda Shilpi

Women empowerment and bringing women in the main stream of development is one of the priority agenda for Bangladesh which is signatory of the "Convention for Elimination of All Sorts of Discrimination against Women (CEDAW)" and committed led to achieve gender equality and equity in every area pf socio-economic activities. The Millennium Development Goals (MDGs) have also emphasized on the equal opportunity for women in every sphere of life.

To ensure equal participation of women in economic development process, it is urgently needed to know their current participation status in different sectors of the economy. In order to monitor the progress of women in different sectors, gender disaggregated data is essential for formulating an effective plan in respect of women empowerment.We hope this will minimize the data gaps and fulfil user specific demands of gender activities. This report will highlight gender disaggregated data for different socio-economic sectors that will be useful for the policymakers, researchers? development partners and gender activists to develop appropriate programs and policies.

Preliminary Literature Review:

In light of the users? demand of gender statistics, Bangladesh Bureau of Statistics has prepared the report on "Gender Statistics of Bangladesh 2012" by using data from different censuses, surveys and administrative reports. It may be mentioned that United Nations Statistical Commission (UNSC) has developed a frame work to compile gender statistics and requested the member states to follow the framework. This framework contains 52 indicators of which Bangladesh has been able to compile as many as 43

indicators. Accordingly, this report has been prepared on the basis of national and international demand to highlight the status of women empowerment and their participation in different sectors of the economy. It covers women participation in education, labor force and employment, income generation, resource mobilization, health care, social services etc. 2030 agenda's pledge to leaving no one behind, role of all agencies is utmost important AND this principle is critical to all women, in particular those facing unique and intersecting challenges like women with disabilities, women in ethnic monitories and women living in rural areas, who must be brought forward and recognize as critical agents of transformative change. They cannot and they will not be left behind.

In 2030 Agenda, Gender Equality is the vital ingredient. SDGs and Statistics (Global Contest):

17 goals, 169 targets and 230 indicators (241 if we count the repetitions).

IEAG estimates that

- Only 42% indicators are at Tier-I, rest are at Tier-II & III.
- 53 of 230 indicators specific reference to women, girls, gender or sex, including 14 indicators in Goal 5.
- Overwhelming 80% of the indicators to monitor SDG 5 related to gender equality lack adequate data.

Tier Classification of Data

Tier 1: conceptually clear
International established methodology and standards; and data are regularly produced by countries, with sufficient coverage to allow tracking progress over time.
Tier 2: data are not regularly produced by countries.
Tier 3: no international established methodology or standards; data are not regularly produced by countries.

SDG FIVE

- 5.1 and all forms of discrimination against all women and girls everywhere (Tier iii- possible custodian agency: UN Women)
- 5.2 eliminate all forms of violence against all women and girls in public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation (Tier ii possible custodian agencies:

UNICEF, UN Women, UNFPA, and WHO)

- 5.3 eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations (Tier I possible custodian agency: UNICEF)
- 5.4 recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies, and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate (Tier ii-possible custodian agency: UN Women)
- 5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic and public life
- 5.5.1 proportion of seats held by women in national parliaments' and local government (Tier i/iii-possible custodian agency: IPU/UN Women)
- 5.5.2 proportion of women in managerial position (Tier i-ILO)
- 5.6 ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Program of Action of the ICPD and the Beijing Platform for Action (Tier iii-possible custodian agency: UNFPA)
- 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws
- 5.a.1 (a) ownership pf agricultural land by sex; and (b) share of women among owners of agricultural land by type of tenure (Tier iii-possible custodian agencies: FAO, UN Women, UNSD)
- 5.a.2 Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantee women's equal rights to land ownership and/or control (Tier iii-possible custodian agencies FAO, World Bank, UN Women)
- 5.b Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women (Tier ii-possible custodian agency: ITU)
- 5.c Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels (Tier iii-possible custodian agencies: UN Women/OECD

Apart from Goal-5

- SDG 8 calls for equal pay for work of equal value;
- SDG 10 addresses in equalities.
- SDG 11 (indicator 11.7 universal access to safe public space for women and girls-indicator on physical and sexual harassment).
- SDG 16 (16.1 homicide by sex/reduce all forms of violence and related death rates; and 16.2 indicator on human trafficking an sexual violence)

Proposed Interventions:

- Conduct assessment of gender statistics
- Create legal frameworks, institutional arrangements and adequate resources for gender statistics
- Produce quality, comparable, regular and accessible gender statistics
- Strengthen NSO's capacity of adopt Tier-ii & iii indicators.
- Create more access opportunities for data users including government, CSO and Private Sector.
- Strengthen capacity of Civil Society, Government and relevant actors on Gender Statistics.

Goal Statement:

Vision and Goals: The vision for women's advancement and rights is to create a society where men and women will have equal opportunities and will enjoy all fundamental rights on equal basis, to achieve this vision; the mission is to ensure women's advancement and rights in activities of all sectors of the economy.

The Government adopted the "National Policy for Women's Advancement (NPWA) 2011 that aims at eliminating discrimination inequality between women and men by empowering them to become equal partners of development. The overall development goal for women's empowerment covers:

(i) Promoting and protecting women's right;

(ii) Eradicating the persistent burden of poverty on women;

(iii) Eliminating discrimination against women;

(iv) Enhancing women's participation in the mainstream of economic activities;

(v) Creating opportunities for education and marketable skills training to enable them to participate and be competitive in all

economic activities;

(vi) Incorporating women's needs and concerns in all sector plans and programs;

(vii) Promoting an enabling environment at the work-place: setting up day care centers for the children of working mothers, career women hostels, safe accommodation for working women;

(viii) Providing safe custody for women and children victims of trafficking and desertion, and creating an enabling environment for their integration in the mainstream of society;

(ix) Ensuring women's empowerment in the field of politics and decision making;

(x) Taking action to acknowledge women's contribution in social and economic spheres;

(xi) Ensuring women's social security against all vulnerability and risks in the state, society and family;

(xii) Eliminating all forms of violation and exploitation against women;

(xiii) Developing women's capacity through health and nutrition care;

(xiv) Facilitating women's participation in all national and international bodies;

(xv) Strengthening the existing institutional capacity for coordination and monitoring of women's advancement;

(xvi) Talking action through advocacy and campaigns to depict positive images of women;

(xvii) Talking special measures for skills development of women workers engaged in the export-oriented sectors;

(xviii) Incorporating gender equality concerns in all trade-related negotiations and activities;

(xix) Ensuring gender sensitive growth with regional balance; and

(xx) Protecting women from the adverse effects of environmental degradation and climate change.

- Male Population has been increased from 78.2 million to 80.5 million during from 2012 to 2016 while the number of female people has been increased by 5.8 million from 74.5 million. (SVRS, 2016)

- The literacy rate of male population (71.9%) is higher than that of female population (67.8%) (SVRS 2016)
- Female people are divorced/separated (1.3%) more than Male ones (0.4%). (SVRS 2016)
- Life expectancy of Female people (72.9) was greater than that of male people (70.3) in 2016 and the situation was same before four years. (SVRS 2016)
- The mean age at first marriage of male people was 25.2 in 2016 and 24.3 in 2013 where as female people 18.4 in 2016 and both 2016 and 2013. (SVRS 2016)
- The disability rate per 1000 population of male population decreased from 11.01 to 9.8 from 2012 to 2016 while the rate of female population decreased from 9.05 to 8.3. (SVRS 2016)
- Household headship rate of male population increased from 85.5% to 87.2% while the rate of female population decreased from 14.5% to 12.8%. (SVRS 2016)
- The survey finding place the labour force participation rate of the population aged is or older at 58.5 percent, at 81.9 percent male and 35.6 percent for females.
- In rural areas, 97.0 percent of the females are in informal sector employment where as it was 90.6 percent in urban areas. At the national level, only 4.6 percent females engaged informal employment and it was 17.7 percent for the male counterpart. (Quarterly labour force survey 2015-2016, BBS)
- The survey measures five forms of violence: physical violence, sexual violence, economic violence, emotional violence, and controlling behavior. Almost two thirds (72.6%) of ever-married women experienced one or more such forms of violence by their husband at least once in their lifetime, and 54.7% experienced violence during last 12 months. Of lifetime experience, controlling behavior was most common, reported by more than half of ever-married women (55.4%). This was followed by physical violence (49.6%), emotional violence (28.7.8% of women), sexual violence (27.3%) and economic violence (11.4%). The experiences of one or more incidents of partner violence during the last 12 months were also measured. The most common form was controlling behavior, experience by more than

one third (38.8%), of ever-married women, followed by emotional violence (24.2%), physical violence (20.8%), sexual violence (13.3%) and economic violence (6.7%). (VAW survey 2015, BBS)

- The survey findings showed that among the not employed population 15 years and over, household activities are generally done by females and they spent 6.2 hours in 24 hours for such work compared to only 1.2 hours by the males. (Time Use Pilot Survey 2012, BBS)
- In case of adult literacy rate (15yrs. and above), 58.6% was literate, males comprised 62.2% and females comprised 55.1% at national level. In case of net and gross enrolment rates at primary educational institutions, the variation of enrolment rates between boys and girls in primary level shows that boy's net enrolment rate was 90.8% while it was 92.1% for the girls at national level. At the national level, gross enrolment rate for boys was estimated at 117.0% and for girls it was 118.5%. The children (6-10 yrs.) never enrolled was estimated at 8.6% and the children enrolled, but dropped out before grade-V was 8.7%. The data indicate that the children "out of school? (never enrolled and dropouts) was 17.3% if all, 17.9% of the boys and 16.7% of the girls at national level. The expenditure incurred for the boys was Tk.12,136 and for the girls the amount spent was Tk.10,962 at national level. (Report on Education Household Survey 2014, BBS)
- Prevalence of tuberculosis is 1.82 (where it is 1.87 in male and 1.75 in female). Prevalence of both high blood pressure and diabetes is higher in male compared to those in female. But prevalence of arthritis per 1000 population is higher in females (77.74) than that in males (60.24). Prevalence of adult impaired persons per 1000 population is 30.96 and it is 34.09 in rural and 20.86 in urban areas. Males are more impaired compared to females in both national and in rural areas but in urban areas females are more impaired than males. Prevalence of child impaired persons per 1000 population was 16.14 and it is 16.99 in rural and 12.98 in urban areas. Males are more impaired compared to females in both national and in rural areas but in urban areas females are more impaired than males. Prevalence of injured persons per 1000 population for 3 months preceding to

the survey is 10.14 whereas prevalence of male injured is 12.92 and that of female is 7.31. Prevalence of severe type of injury/wound per 1000 was 2.26 whereas it is 3.13 for males and 1.38 for females and the proportion of severe type of injured/wounded persons among all the injured persons is 22.3%. Other than burn and sprained, in all types of injury males are more than females. Prevalence of death persons due to accident per 1000 population for 3 months preceding to the survey is 0.37 whereas prevalence of male injured was 0.51 and that of female is 0.22.(Report on Health and Morbidity Status Survey 2014, BBS)

- Poverty incidence is found to be significantly less for female-headed households than that for male-headed ones. Using the upper poverty line, the HCR of incidence of poverty is 32.1% for the male heads where, 206.6% for the female heads. The net percentage of population suffering from any type of disability is about 9.07%-8.13% for males and 10.00% for females. (Report of the Household Income & Expenditure Survey 2010, BBS)
- Of the total establishments, the female headed is 7.21% (5,63,368) in 2013 while it was 2.80% (1,03,858) in 2001 & 03. (Economic Census 2013, BBS)
- The number of male child labour is 0.95 million and female child labour is 0.75 million, male exceeds the female. The average working hour of the working children is 39 hours each week without male female difference, and the average monthly income received is Tk.5859, male's one slightly higher than the female. The most common hazard the working children face at the work place includes exposure to dust, fumes, noise or vibration, relevant percentage is 16.84%. Being subject to constant shouting and insult from employer is reported by 17.1% working children, while 2.5% reported sexual abuse with 5.6% among the female working children. (Child Labour Survey Bangladesh 2013, BBS)

The literacy rate of floating people were 18.82% of which 18.82% were male, 8.83% female and 17.65% were hijra people. (Census of Slum Areas and Floating Population 2014, BBS)

References:

BBS	Sample Vital Registration System, 2016
BBS	Quarterly labour force survey 2015-2016
BBS	Statistical Pocket Book Bangladesh, 2010
BANBEIS	Bangladesh Education Statistics, BANBEIS, 2010
GED	6th five Year Plan, (FY2011-FY2015), Planning Commission
BBS	Wage Rate and Earning of Non-Farm Workers, April, 2011
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
ICDDRB	Maternal Mortality and Health Care Survey 2010
BBS	Multiple Indicator Cluster Survey 2009
BBS	Report of the Household Income & Expenditure Survey 2010
BBS	Gender Statistics of Bangladesh 2008
BBS	Wage Rate of Working Poor in Bangladesh,

লেখক পরিচিতি
Joint Director
Bangladesh Bureau of Statistics

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের কিছু কার্যক্রম

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নেটওয়ার্কের সদস্যদের নৃত্য পরিবেশনা

৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নেটওয়ার্কের সদস্যদের
নৃত্য পরিবেশনা

আয়কর বিষয়ক অগ্রিম প্রস্তুতি ও রিটার্ন তৈরির
পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনার

বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং ক্যাম্প আয়োজন

মুন্সীগঞ্জ জেলায় বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ

নেটওয়ার্কের উদ্যোগে সিলেট বিভাগে বন্যার্তদের মাঝে
ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

সিলেট বিভাগে নেটওয়ার্কের উদ্যোগে বন্যার্তদের মাঝে
ত্রাণ বিতরণ

২য় বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৭

২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় নেটওয়ার্কের সদস্যদের সাথে মেহের আফরোজ চুমকি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় রোভার স্কাউট সদস্যদের সাথে
নেটওয়ার্কের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ

২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের মাননীয় সচিব
আকতারী মমতাজ-এর কবিতা আবৃত্তি

নেটওয়ার্কের সভাপতি ও মহাসচিবের সাথে সদস্যবৃন্দ

২য় বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ

২য় বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৭ অনুষ্ঠানে বিপিএটিসি'র রেক্টর
ড. এম আসলাম আলম, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে নেটওয়ার্কের সদস্যবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে বিসিএস পরীক্ষা
পদ্ধতি অবহিতকরণ কর্মশালার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি'র সাথে নেটওয়ার্কের
সভাপতি ও মহাসচিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতি অবহিতকরণ
কর্মশালার একাংশ

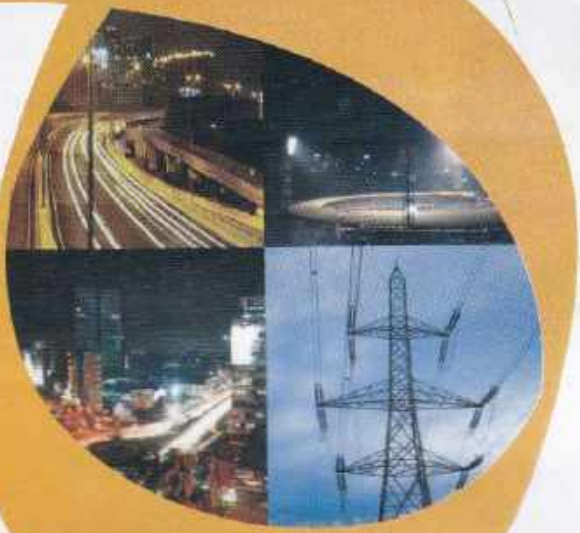

Environment Friendly
Cables
BBS CABLES®
more than safety
Safety around you
All types of PVC/XLPE LT Cables
XLPE HT Cables up to 33 KV
Overhead Conductors up to 132 KV
Various types of Telecommunication Cables
LSOH/LSHF/LSZH Cables
Lead Free
101% Copper Conductivity
100% On-line Annealing with German Technology
Pre-Spiraling Milliken Conductor Technology
Extrusion lines with SIKORA Technology
Corporate Office

প্রশিক্ষণের শিক্ষা

সুশাসনের শিক্ষা

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
www.napd.gov.bd

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়ে থাকে:

Sl.No	Course Title	Working Day	Course Fee
	Day Courses (09:00 AM to 05:00 PM)		
1.	Project Appraisal, EIA and Formulation of DPP	15	18,000.00
2.	Human Resource Management	05	8,000.00
3.	Project Appraisal Study	05	8,000.00
4.	Departmental Training for BCS (Economic) Cadre Officers	45	45,000.00
5.	Office Management	10	14,000.00
6.	Management Skills for Project Executives	05	8,000.00
7.	Public Financial Management	05	8,000.00
8.	Leadership and Strategic Planning	05	8,000.00
9.	IMED Monitoring & Reporting Procedure	05	8,000.00
10.	Microsoft Project	05	8,000.00
11.	Development Planning and Project Management	15	18,000.00
12.	Public Procurement Management	15	18,000.00
13.	Transparency, Accountability & Good Governance	05	8,000.00
14.	Financial and Economic Appraisal of Projects	05	8,000.00
15.	Monitoring and Evaluation of Development Projects	10	14,000.00
16.	Public Private Partnership (PPP)	05	8,000.00
17.	Research Methodology	05	8,000.00
18.	e-Governance for Sustainable Development	05	8,000.00
19.	Environmental Issues of Project Management	05	8,000.00
	Evening Courses (Sunday, Monday & Wednesday)		
20.	Advanced Microsoft Excel	10	10,000.00
21.	English Language Proficiency	45	18,000.00
22.	Project Planning, Development and Management (PPDM)	75	30,000.00
23.	Computer Basics	15	12,000.00
24.	Oracle based Database Application Design	20	15,000.00
25.	Office Automation for Organizational Development	12	11,000.00
26.	Microsoft Project	10	10,000.00
27.	Web page Development and Deployment	25	18,000.00
28.	Introduction to SPSS	10	10,000.00
29.	Post Graduate Diploma in Development Planning	01 Year	40,000.00
30.	Post Graduate Diploma in ICT for Development	01 Year	50,000.00

যোগাযোগঃ

(ক) পরিচালক (প্রশিক্ষণ), এনএপিডি
ফোনঃ ৫৮৬১১২৫৯ (অফিস)

(খ) প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এনএপিডি
মোবাইলঃ ০১৯১৩৭৫৬৭৫৮

C:\DOCUME~1\COLLAG~1\LOCALS~1\Temp\AR Training Duration & Cost.docx